পাঠ-সঞ্চয়ন

সপ্তম শ্রেণী

Recomended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII. Vide T.B. No. 76/7/TB/15 and Board's letter No. RB/76/DS/1 dated 24. 12. 76

পাঠ-সঞ্চয়ন

[সপ্তম শ্রেণী]

কালীপদ আচার্য, এম. এ., বি. টি.
ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ;
প্রাক্তন শিক্ষক, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা ;
ডায়মণ্ডহারবার হাই স্কুল, ২৪ পরগণা।

ও

অরবিন্দ মণ্ডল, বি. এ. (অনার্স), বি. টি.
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়, দাঁইহাট, বর্ধমান। ব্যাকরণ ও রচনা প্রদর্শিকা (৭ম ও ৮ম শ্রেণী) গ্রন্থ প্রণেতা।

টিচার্স বুক এজেন্সী
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
এস. রায়
টিচার্স বুক এজেন্সী
১৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

পঞ্চম সংস্করণ :
ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য—৫·০০ টাকা মাত্র।

[ভারত সরকার প্রদত্ত হ্রাস-মূল্যের কাগজে মুদ্রিত।]

মুদ্রাকর :
সুকুমার মল্লিক
এ. বি. প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গদ্যাংশ		
কালাদীঘির ধারে ইন্দিরা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
অমলের চিঠি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬
সাইক্লোন	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১
মাইকেল ফ্যারাডে	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৭
দাসের আত্মচেতনা	এস. ওয়াজেদ আলী	২২
জানালার পাশের বন	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
মানবতাবাদী যোদ্ধা সন্ন্যাসী	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	৩১
মণিমহেশ	উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩৪
দ্বীপান্তরের কারাকক্ষে	সতীশ পাকড়াশী	৪০
কৃষিকাজে ভারত	সুরেশ মৈত্র	৪৬
চন্দ্রাভিযান	অরবিন্দ মণ্ডল	৫১
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিকথা		৫৫
পদ্যাংশ		
বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬১
শ্রীরামের পরাজয়ে সীতার শোক	কৃত্তিবাস ওঝা	৬৩
কৌরব সভায় কৃষ্ণ	কাশীরাম দাস	৬৫
স্পর্শমণি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭
আবার তোরা মানুষ হ'	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৬৯
সাধনা	প্রিয়ংবদা দেবী	৭০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অপরাজিতা	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	৭১
বিদ্যাসাগর	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৭৩
মুঠি-মন্দির	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৭৫
হরিদাস	কবিশেখর কালিদাস রায়	৭৭
বিয়ে বাড়ির মজা	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৭৮
ফাগুন দুপুরে	সজনীকান্ত দাস	৮০
ঈস্— !	সুনির্মল বসু	৮১
মাটির রাজা	কাজী নজরুল ইসলাম	৮৩

———



পথে কালাদীঘি নামে এক দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। পাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি। এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই-জন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা কিছু জল-টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায় কেবল ঠাকুরদেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌঁছি—কোথায়, বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে। তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্‌……

এই ভাবিতে ভাবিতে আমি ক্ষণেক পরে অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাৎ গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষ তলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার নিকট হইতে দেড় বিঘা। দেখিলাম যে সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারিপার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত "পাহাড়", পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃতভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী: পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

আকাশপানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা! কি সুন্দর শ্বেত মেঘের স্তর পরস্পরের মূর্তিবৈচিত্র্য—কিবা নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষী সকলের নীলিমামধ্যে বিকীর্ণ কৃষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা! মনে মনে হইল, এমন কোন বিদ্যা নাই কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌঁছিতাম!

আবার সরোবরপ্রতি চাহিয়া দেখিলাম—এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম যে, বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুর বাড়ীর, একজন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সেদিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য! ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার আর একজন! এইরূপ চারি জন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে! কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে? পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পালাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সেই ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচ দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাত-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, যেখানে নামাইল, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও নইলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্বস্ব লইয়া পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে বলিল, "বাছা অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরৎ হইবে।

তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।" ……তাহারা চলিয়া গেল।

অনুশীলনী

১। (ক) কালাদীঘির একটি বর্ণনা দাও।

(খ) ইহাকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলা হয় কেন? ঐ অঞ্চলের নামটিই বা কি?

(গ) এখানে কে কিভাবে এবং কেন আসিয়াছিল? তাহার সঙ্গে কাহারা ছিল?

(ঘ) দ্বারবান এবং বাহকেরা কোন্ বিষয়ে একমত হইল? ইহাতে কি তাহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়?

(ঙ) তাহারা তখন কি করিল?

(চ) পাল্কীর ভিতরে বসিয়া ইন্দিরা কি ভাবিতেছিল?

(ছ) বৃক্ষ হইতে কাহারা লাফাইয়া পড়িল? তাহারা তখন কি করিল?

(জ) দ্বারবান ও বাহকেরা ইহা দেখিয়া কি করিল?

(ঝ) দস্যুরা পাল্কী লইয়া কোথায় আসিল এবং কি করিল তাহার বিবরণ দাও।

২। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) তারা যাইতেছে · ……রাগ হইল।

(খ) তাহাদের অঙ্গচালনে………হইতেছে।

(গ) দস্যুর সংসর্গও………হইল।

৩। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

তৃণাবরণ, ক্ষুদ্রোর্ম্মি, বিকটাকার, পুনশ্চ, নিরস্ত, নভস্তল, উড্ডীন, নির্ব্বিঘ্ন।

(খ) বাক্য গঠন কর :—

সমাগম, বিরল, জল-টল, শ্যামল, জলজ, শৈবাল, বিক্ষিপ্ত, নিরস্ত, ভরসা, দলবদ্ধ, বিকটাকার, উৰ্দ্ধশ্বাস।

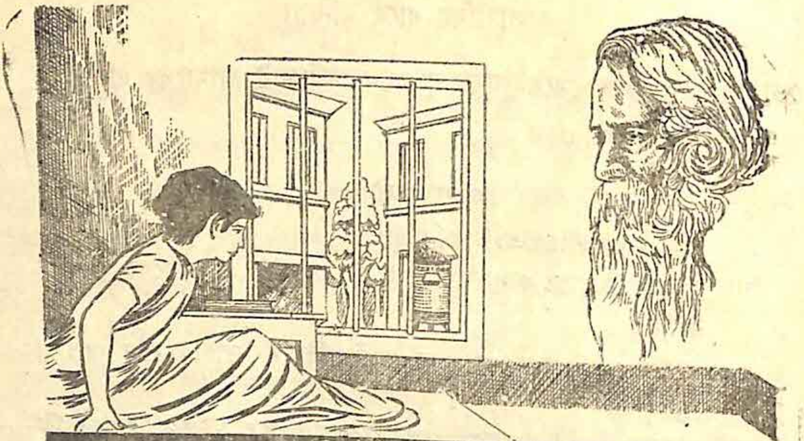
(গ) শব্দ লিখ :—

সমাগম, বিরল, দ্বারবান, ক্রোশ, নিবিড়, তরঙ্গহিল্লোল, উর্ম্মি শ্যামসলিল, নীলিমা, ভরসা, শিবিকা, স্পৃহণীয়, সোহরৎ, হতাশ্বাস।

(ঘ) বিপরীত শব্দ লিখ :—

বন্ধু, গুরু, নিরস্ত, অগ্রসর, অচেতন, মুক্ত।

A vivid description of a decoity of terrific nature!



অমলের চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**চরিত্র ঃ অমল**—রুগ্‌ণ বালক ; **ঠাকুরদা**—ফকিরবেশী গ্রামের বৃদ্ধ ; **মাধবদত্ত**—পিসেমশায়। **দৃশ্য ঃ** অমলের রোগশয্যা।]

অমল। ফকির, পিসেমশায় তো গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপি চুপি বলো-না, ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে ?

ঠাকুরদা। শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।

অমল। পথে ? কোন্ পথে ? সেই-যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে ?

ঠাকুরদা। তবে তো তুমি সব জানো দেখছি—সেই পথেই তো।

অমল। আমি সব জানি ফকির।

ঠাকুর। তাই তো দেখতে পাচ্ছি—কেমন করে জানলে ?

অমল। তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে, কত দিন তা মনে পড়ে না। বলব ? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি ! কত দিন—কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্নার পথ

যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে —নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই আসছে—তার পরে আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাত দিন একলাটি চলে আসছে—ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা। অমন নবীন চোখ তো আমার নেই, তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জানো?

ঠাকুরদা। জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল। সে তো বেশ। আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে?

ঠাকুরদা। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল। না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে 'জয় হোক' বলে ভিক্ষা চাইব—আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে, না?

ঠাকুরদা। সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

অমল। আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির? আমাকে একজন বলেছে, আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে—আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুরদা। কে বলো দেখি।

অমল। ছিদাম।

ঠাকুরদা। কোন্ ছিদাম?

অমল। সেই-যে অন্ধ, খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে, ঠিক আমার মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়ীতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুদা। সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল। সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে; তিনি বলেন, ও মিথ্যা কানা মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানাই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না—সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ওইটুকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না—তা ওকে কানা বল আর নাই বল। তা, ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে?

অমল। ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বলো সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই-যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিষের কোনো ভার নেই, যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হালকা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুর। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল। ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতে পাবে না—ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল—

আমি ওকে বললুম, ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা। বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ?

অমল। না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।—কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা। তা নাই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে—তা হলেই হল।

[মাধব দত্তের প্রবেশ]

মাধব দত্ত। তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি।

ঠাকুরদা। কেন, হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা। তাতে হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছেন।

ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কানে ওঠে সে কি আমরা জানি নে?

মাধব দত্ত। তবে সামলে চল না কেন? রাজা-বাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আনো কেন? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুশকিলে ফেলবে।

অমল। ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা। অমনি বললেই হল! রাগ করবে! কেমন রাগ করে

দেখি-না। আমার মতো ফকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ ক'রে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।

অমল। দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারেই চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়—যদি—

ঠাকুরদা। (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

অনুশীলনী

১। ডাকঘর সম্পর্কে অমলের কৌতূহল মিটাইতে গিয়া ঠাকুরদা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লিখ। রাজার চিঠি সম্বন্ধে ঠাকুরদা কি বলিয়াছিলেন?

২। অমলের নামে বেনামী চিঠি কে লিখিয়াছিল? অমলের রাজা রাগ করবে প্রশ্নে ঠাকুরদা কিভাবে বুঝাইয়াছিলেন? সকালবেলা থেকে অমলের অবস্থাটা কেমন ছিল?

৩। বাক্য গঠন কর :—

থেকে-থেকে, ডাকহরকরা, অবধি, মুশকিল, খঞ্জনি, ফেসাদ, স্তব্ধ।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

পাহাড়ের — কাছে — পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে — নদীর — ধরে সে কেবলই — আসছে।

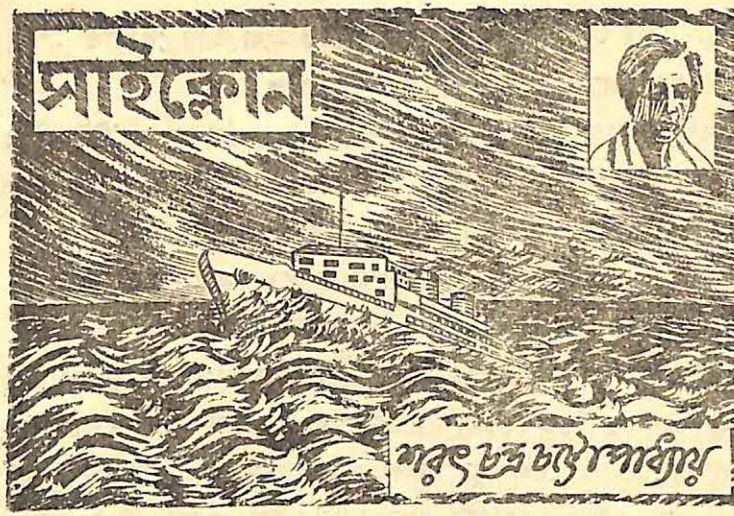
৫। (ক) নীচে মোটা অক্ষরের পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

লণ্ঠন হাতে **ঘরে ঘরে** তোমার **চিঠি** বিলি করে বেড়াব।

(খ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাহির কর :—

নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই।

Part of a symbolic drama.



ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন, ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি —কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা' অদৃষ্টে যা ঘটে, তা' ঘটুক।......

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল ; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হৌক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য ! মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়া কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ত্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল,

এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব ক'টিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই 'ছাই-ক্লোন'; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই, এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র এক ডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাত শত রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাত শত রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাত শত নয়, শতকোটি;—উন্মত্ত কোলাহলে এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল—রাক্ষসী নয়,—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ

হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌ বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল, তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুইটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে!

এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই! যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাট মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে, আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা' ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ সম্রাট্‌! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে, সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত' তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবর খানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিষের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ, তা' হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত

ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয় ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ু-বেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশে-পাশে, উপরে নীচে চারিদিকেই কালো জল! জাহাজশুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে; কিন্তু মিনিট খানেক পরে দেখা গেল, না ডুবি নাই, জাহাজশুদ্ধ আবার জলের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গের আর শেষ হয় না! আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এক্ষণে টের পাইলাম কেন কাপ্তেন-সাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্ত্তে পুরিয়া চাবি-বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস ও মুরগীগুলো বারকতক ঝট্‌পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলো কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি

শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ জুটিল! শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাহাই নয়, সমস্ত জাম-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্-ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল, জলে ডোবার হাত হইতে যদি বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হৌক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে না বেঁধে। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেই লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্বপরিবর্ত্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়, অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয় ত' বাঁচিতেও বা পারি।

অনুশীলনী

১। সমুদ্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৃশ্যটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। (ক) কাপ্তেনের নজর এড়াইবার জন্য বক্তা (শ্রীকান্ত) কি করিলেন? তিনি সেখানে কি দেখিলেন?

(খ) সাইক্লোন কি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

৩। 'ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে।'—উক্তিটি কাহার? কি প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি

করা হইয়াছে? 'চোখ সার্থক করিলে'—এই কথাটির তাৎপর্য কি? চোখ যাহা দেখিয়া সার্থক হইল তাহার পরিচয় দাও।

৪। প্রসংগ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর:—

(ক) কিন্তু সে যে সাগরের……অপেক্ষা করিতে হইল।

(খ) এতদিন ধরিয়া তো সংসারের……কখনও দেখিতে পাই নাই।

(গ) কারণ তা হইলে……যথেষ্ট।

৫। শব্দার্থ বল ও বাক্যগঠন কর:—

আসন্ন, সুনজর, অচিন্তনীয়, গোষ্পদ, হৃদয়ঙ্গম, উধাও, অপরিমেয়, দুর্জ্জয়, মিয়াদ, কিরীট, রজত-শুভ্র, কলেবর, ভয়ার্ত্ত, নিস্তার, দ্বিধা, ভবলীলা।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—

আবর্ত, গোষ্পদ, দুর্জ্জয়, সার্থক, শুভাগমন, ততোধিক, নিস্তার, অন্বেষণ, হিমালয়, ভয়ার্ত্ত, নিরাপদ।

৭। পদ পরিবর্তন কর:—

আবির্ভাব, আসন্ন, অন্বেষণ, অচিন্তনীয়।

৮। বিপরীতার্থক রূপটি দেখাও:—

আশ্রয়, নিরাপদ, আকৃতি, অন্ধকার, অমঙ্গল, উন্মত্ত. কোলাহল, সার্থক, দুর্জ্জয়, সংঘর্ষ, সাধ্য, বিলম্ব, বিপুলত্ব, বিস্তৃতি, জীবন্ত, সমাপ্তি, ক্ষুদ্র।

৯। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর (রেখা চিহ্নিত পদগুলির):—

(ক) মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে।

(খ) সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল।

(গ) রাজবাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি।

১০। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাহির কর:—

ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

A fine picturesque description of a cyclone in bay of Bengal.



ব্যাটারি থেকে আমরা তড়িৎপ্রবাহ পাই, কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ পাবার এইটেই যদি একমাত্র উপায় রয়ে যেত তবে মানব সভ্যতা আজ অনেক পিছনে পড়ে থাকত। যে প্রচণ্ড তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে ট্রেন, ট্রাম চালান হয়, পাখা ঘোরান হয়, একটা গোটা শহরকে আলোকিত করা হয়, বড় বড় ওজন তোলা হয় তার উদ্ভব হচ্ছে অন্য উপায়ে। সে পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন মাইকেল ফ্যারাডে, উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক।

জন্মগ্রহণ করে মাইকেল এই ভূমণ্ডলকে একটি সুখের স্থান বলে লাভ করেননি। তাঁর পিতা ছিলেন একজন কামার আর মাতা একটি চাষীর কন্যা। যখন তাঁর বয়স দশ তখন এই ফ্যারাডে-পরিবার দারিদ্র্যের চরম তলে এসে পৌছয়, সাধারণ দরিদ্র-ভাণ্ডার থেকে তাদের খোরাক যাচ্ঞা করে আনতে হত, আর মাইকেলের ভাগে ছিল সপ্তাহে মাত্র একখানা রুটি। কদর্য ঘরে তারা বাস করত, আর তা এত ছোট যে বাড়ির সকলের তাতে সংকুলান হত না, কাউকে কাউকে লণ্ডন শহরের রাস্তায় রাত্রি যাপন করতে হত।

তের বছর বয়সে মাইকেল এক দপ্তরীর কারখানায় নিযুক্ত হল, কাজ রইল, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা পরিষ্কার করা, খবরের কাগজ ও চিঠি পত্র বিলি করা। এক বছর এই কাজ করার পর তাকে বই বাঁধাই-

এর কাজ শেখান হল। এখন মাইকেল হরেক রকম বই-এর সংস্পর্শে এল, বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পড়বার সুযোগ পেল। বেতন ছিল অতি সামান্য, কিন্তু তার থেকেও কিছু কিছু জমিয়ে টিকিট কিনে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে যেত। যে বক্তৃতা শোনে তার সারাংশ টুকে রাখে, শেষে পুস্তকাকারে সেগুলি বেঁধে নেয়। এই রকমের চার খণ্ড পুস্তক হল।

তারপর এক শুভ মুহূর্ত দেখা দিল। দোকানের একজন খদ্দের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বালকের অনুসন্ধিৎসা দেখে তাকে রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে চারটি বক্তৃতা শোনবার টিকিট কিনে দিলেন। কে এ বক্তৃতা দেবে? তখনকার দিনের দেশবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বাগ্মী স্যার হমফ্রে ডেভি। ডেভির মর্মস্পর্শী বক্তৃতা ফ্যারাডেকে অভিভূত করল, তিনি সেগুলির তাৎপর্য টুকে নিয়ে বাড়িতে এসে বিস্তৃত আকারে লিখে ফেললেন, যথাযথ স্থানে চিত্র সংযোজন করলেন, তারপর সেগুলিকে বই এর আকারে বেঁধে নিলেন। এখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা হল বই বাঁধাই-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞানের সেবা করা, সেজন্য তাঁকে রয়াল ইন্‌স্টিটিউ-শনের একজন কর্মী হতে হবে, তা যে কাজ তাঁকে দেওয়া হোক।

কিন্তু দপ্তরীর কারখানায় শিক্ষানবিশ একটি অশিক্ষিত ছেলের আবেদন রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনের কর্তাদের কাছে পৌছবে কি করে? মাইকেল ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির কাছে একখানা আবেদন পত্র পাঠালেন, কোন উত্তর এল না। আর কোন উপায় না দেখে মুহ্যমান বালক সোজাসুজি ডেভিকে লিখলেন, ডেভির বক্তৃতার সারাংশ যে বাঁধান খাতায় লেখা ছিল সঙ্গে সেই খাতাখানাও পাঠালেন।

এরপর একদিন ফ্যারাডের অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ভাঙা বাড়ির সামনে এক জুড়ি এসে থামল। তকমা আঁটা এক চাপরাশি গাড়ি থেকে নেমে ফ্যারাডের হাতে এক চিঠি দিল। ফ্যারাডের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ১৮১৩ সালে, বাইশ বছর বয়সে মাইকেল ফ্যারাডে রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে একজন সহকারীরূপে নিযুক্ত হলেন, বেতন হল

সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং। ডেভির এই গুণগ্রাহিতার জন্যে আজ সমগ্র পৃথিবী তাঁর কাছে ঋণী। যে প্রতিভা একদিন সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করল তা চিরদিন অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকত যদি না ডেভি তার সম্যক বিকাশের সুযোগ দিতেন।

ফ্যারাডে যখন রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে যোগ দিলেন তখন কলেজ তো দূরের কথা, স্কুলের পুরো শিক্ষাও তিনি পান নি। একেবারে গোড়া থেকে তাঁকে আরম্ভ করতে হল। এই সময় ডেভির নাম বৈজ্ঞানিক জগতে ব্যাপ্ত। কয়েক মাস পরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পরিদর্শন করতে যাত্রা করলেন, সঙ্গে নিলেন ফ্যারাডেকে। এ ভ্রমণে ফ্যারাডের ক্লেশের অবধি ছিল না, কারণ তাঁকে ডেভির চাকরেরও কাজ করতে হত, কিন্তু অন্যদিকে তিনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হলেন। ওই সব দেশে যে সকল বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি তাঁদের সংস্পর্শে এলেন, তাঁদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

স্বদেশে ফিরে এসে তিনি স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করলেন। প্রথম দিকে তাঁর অনুসন্ধান ছিল রসায়নবিদ্যা সম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয়ে। কার্বন ও ক্লোরিন ঘটিত দুটি যৌগিক পদার্থ বের করলেন, এর একটি আজও আগুন নেবানর কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন একটির পর একটি তাঁর আবিষ্কার প্রকাশিত হতে থাকল। তড়িৎ প্রবাহের ফলে যখন রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে তখন কতটা পরিমাণ পদার্থ বাহির হয়ে আসে সে সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করলেন। ১৮২৪ সালে, দপ্তরীর কারখানায় শিক্ষানবিশ হয়ে যিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন, তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হলেন, আর পরের বছর, ডেভি অবসর গ্রহণ করলে, তিনি ওখানকার পরীক্ষাগারের পরিচালকরূপে মনোনীত হলেন। একবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, কিন্তু ফ্যারাডে ওই পদ গ্রহণ করলেন না, কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, যে

প্রতিষ্ঠান এই দীর্ঘকাল তাঁকে কাজের সুবিধা দিয়ে চলেছে, অধিক বেতন বা মর্যাদার লোভে, তিনি সেই প্রতিষ্ঠানকে ত্যাগ করতে পারেন না।

এর আগে তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধে তিনি এক পরীক্ষা করেন। দেখান যে, একটা চুম্বকদণ্ডের উপরে যদি একটা তার থাকে, আর ওই তারের মধ্যে দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তবে ওই চুম্বকদণ্ডের চারদিকে তারটা ঘুরতে থাকবে। ভবিষ্যৎ তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধে যে পরীক্ষা ফ্যারাডেকে অমর করেছে, এই পরীক্ষা হল তার সূচনা। ফ্যারাডে ভাবতে লাগলেন,—তড়িৎ প্রবাহ যদি চুম্বকের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে তবে চুম্বকের ক্ষেত্র নিশ্চয় কোন উপায়ে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করবে। এই কল্পনা নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন, আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না, সফলতা তাঁকে দেখা দিল।

একদিন রয়াল সোসাইটি ভবনে দর্শকমণ্ডলীর সামনে ফ্যারাডে তাঁর পরীক্ষাটা করলেন। খুবই সাদাসিধে পরীক্ষা। একটা তারের কুণ্ডলী আছে, আশেপাশে কোথাও কোন সেল নেই। কুণ্ডলীর মধ্যে ফ্যারাডে একটা চুম্বক-দণ্ড দ্রুত প্রবেশ করালেন, মুহূর্তের জন্য কুণ্ডলীর মধ্যে একটা তড়িৎ প্রবাহ চলে গেল, চুম্বকটা বার করে নিলেন আবার মুহূর্তের জন্য তড়িৎস্রোত বিপরীত দিকে গেল। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু সভায় অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন যারা বিজ্ঞানের কোন ধার ধারতেন না। গ্ল্যাডস্টোন তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, তিনিও ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফ্যারাডেকে প্রশ্ন করলেন,—এ মানুষের কি কাজে লাগবে? ফ্যারাডে উত্তর করলেন,—হয়ত এমন দিন আসবে যখন এ দিয়ে আপনি অনেক কর আদায় করতে পারবেন। সেদিন আসতে খুব বেশি দেরি হল না। ফ্যারাডের পরীক্ষার মূল কথা নিয়ে বড় বড় ডায়নামো তৈরি হতে থাকল, আর সেই ডায়নামো চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হতে লাগল। শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ অনেক জায়গায়

ষ্টিম এঞ্জিনকে হঠিয়ে দিয়ে কল চালাল, বড় বড় নগর আলোকিত করল, পাখা ঘোরাল, ট্রাম ছোটাল। শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে টেলিগ্রাফ পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে সংবাদ আনল, টেলিফোনে দূর দূরান্তর থেকে মানুষ কথা বলাবলি করল। শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহ না পেলে আজ রেডিও দেখা দিত না।

অনুশীলনী

১। (ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক কে? কি কারণে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেওয়া হইয়াছে?

(খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে আসিবার পূর্বে মাইকেল ফ্যারাডের জীবনের পরিচয় কিরূপ ছিল?

(গ) কোন্ বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসিয়া মাইকেল ফ্যারাডের জীবনধারা বদলাইয়া গেল? এই বৈজ্ঞানিকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

(ঘ) ফ্যারাডের প্রথম দিক্‌কার আবিষ্কারের নাম লিখ এবং ঐ আবিষ্কার মানবজাতির কোন্ কাজে লাগে?

(ঙ) মাইকেল ফ্যারাডের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটির পরিচয় দাও। ইহা বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় কোন্ কোন্ দিক খুলিয়া দিয়াছে?

২। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) যে প্রতিভা একদিন……সুযোগ দিতেন।

(খ) এ কল্পনা নিয়ে………তাঁকে দেখা দিল।

৩। শব্দার্থ লিখ:

উদ্ভাবক, যাজ্ঞা, কদর্য, সংকুলান, অনুসন্ধিৎসা, বাগ্মী, মর্মস্পর্শী, তাৎপর্য, আকাজ্ক্ষা, মুহ্যমান, অভিভূত, চাপরাশি, গণ্যমান্য।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

পদ্ধতি, যাজ্ঞা, সংকুলান, পুস্তকাকারে, গবেষণা, প্রতিষ্ঠান, নিশ্চয়, আবিষ্কার, দূরান্তর।

Some noteworthy incidents in the life of a world famous scientist



দাসের আত্মচেতনা

এস. ওয়াজেদ আলী

সুলতান মাহমুদের আরাজ নামক এক দাস ছিল। সুলতান তাকে একান্ত স্নেহ এবং বিশ্বাস করতেন। দরবারে আরাজের মত প্রতিপত্তি বড় বড় আমীর ওমরাহদেরও ছিল না। বলা বাহুল্য, আরাজের প্রতিষ্ঠা দেখে দরবারের কর্ম্মচারীদের তার উপর ভয়ানক হিংসা হলো। সুলতানের চক্ষে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আরাজের দোষত্রুটির সন্ধানে একান্ত ভাবে তাঁরা তৎপর হলেন। আর তার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন।

তাঁরা দেখলেন রাত্রে দরবার শেষ হবার পর আরাজ প্রত্যহ প্রাসাদ ছেড়ে নগর উপকণ্ঠে এক কুটীরে যায়, আর ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে সেখানেই রাত্র যাপন করে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাসাদে ফিরে আসে।

হিংসুকের মনে সহজেই সন্দেহ এসে দেখা দেয়। সভাসদেরা ভাবলেন আরাজ অতি চতুর লোক। রোজ সে প্রাসাদ থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনে আর এই কুটীরে সেগুলি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য লুকিয়ে রাখে। সুলতানকে এ বিষয়ে খবর দিলে তিনি আরাজের প্রকৃত চরিত্রের বিষয় অবহিত হবেন, আর তাকে দরবার থেকে তাড়িয়ে দেবেন। মূষিকের যা হয়েছিল আরাজেরও তাই হবে।

দলবেঁধে স্থলতানের কাছে তাঁরা উপস্থিত হলেন, আর আরাজের অদ্ভুত আচরণের বিষয়ে তাঁকে অবহিত করলেন। স্থলতান বললেন, "কেন? এতে ক্ষতি কি?" দরবারীরা বললেন, "হুজুর, ব্যাপারটা অত সোজা মনে করবেন না। নিশ্চয় এই চতুর দাস প্রাসাদ থেকে মূল্যবান মণিমুক্তাদি অপহরণ করে তার কুটীরে রেখে আসে। চালাক লোক, ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করে। দরবারে যখন ওর বর্ত্তমান প্রতিপত্তি থাকবে না, তখন যাতে আরাজ দিন চালাতে পারে তার ব্যবস্থা এখন থেকেই আরাজ করে রাখছে।"

সভাসদ্‌দের কথায় স্থলতানের বিশ্বাস হল না। তবু প্রকৃত ব্যাপার কি, জানবার জন্য তাঁর আগ্রহ হল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, একদিন আমরা আরাজের পেছনে পেছনে যাব। দেখা যাবে কেন সে কুটীরে যায়, আর কি করে সেখানে গিয়ে।"

দরবারীরা খুব খুশী হলেন। ভাবলেন এবার চোরটা ধরা পড়বে, আর তার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

প্রথামত প্রাসাদের কাজ শেষ করে গভীর রাত্রে আরাজ তার কুটীরের উদ্দেশ্যে বের হল। সভাসদ্‌দের সঙ্গে স্থলতান তার অনুসরণ করলেন। নগরের বাইরে এসে আরাজ তার কুটীরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কুটীরের দরজায় হাত দিয়ে আস্তে করে স্থলতান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আরাজ দরজা খোল!"

দরজা খুলে আরাজ স্থলতানের সম্মুখে দাঁড়ালো। পরনে তার মেষপালকের ছিন্নবস্ত্র—মুখে একান্ত বিস্ময় পরিস্ফুট। সভাসদেরা পেছনে দাঁড়িয়ে মুচকে হাসছেন—এবার চোর ধরা পড়েছে। ধর্ম্মের জয় না হয়ে পারে না।

স্থলতান বললেন, 'আরাজ তুমি মেষপালকের দীনহীন বস্ত্র কেন পরেছ? রাত্রিযাপনের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে এই পর্ণ কুটীরেই বা কেন এসেছ?"

সুলতানের কথা শুনে, আর সভাসদ্‌দের মুখের হাসি দেখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরাজ মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে সুলতানের পদচুম্বন করে সে বললে, "জাঁহাপনা! একদিন আমি মেষপালক ছিলুম। আপনার দয়ায় আজ দরবারে স্থান পেয়েছি। যখন মেষপালক ছিলুম তখন এই ছিন্নবস্ত্র পরে এই পর্ণ কুটীরেই কালাতিপাত করতুম। এখন রাজপ্রাসাদে থাকি, মূল্যবান জরির কাজ করা রেশমের গাত্রাবরণ পরি। অবস্থার এই আকস্মিক এবং আমূল পরিবর্ত্তনে আমার মনে আতঙ্ক এসে উপস্থিত হল। ভাবলুম ঐশ্বর্য্য এবং জাঁকজমকের মধ্যে প্রাথমিক জীবনের দৈন্য এবং দারিদ্র্যের কথা একেবারে আমি ভুলে যাব। অহমিকা এবং দম্ভ চরিত্রকে বিকৃত করে দেবে। দরিদ্রের প্রতি আমি ঘৃণার ভাব পোষণ করব। যে নম্রতা মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তা থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমার চরিত্রের বিকৃতি দেখে আপনি আমার প্রতি আপনার স্নেহ এবং বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন। আর আপনার চেয়ে যিনি বড়, বিশ্বের যিনি সুলতান, সেই মহিমাময় খোদা তিনিও আমায় ভুলে যাবেন। ফলে আমারই সর্বনাশ হবে।

এরূপ যাতে না হয় তারই জন্য এই অদ্ভুত আচরণ আমি করি, জমকালো পোশাক পরে সমস্ত দিন প্রাসাদে কাজ করি। তাই গভীর রাত্রে প্রাসাদের কাজ শেষ করে এই পর্ণ কুটীরে ফিরে আসি, আর প্রাসাদের জমকালো পোশাক ছেড়ে আবার মেষপালকের দীনহীন কাপড় পরে রাত্রিযাপন করি। কি ছিলাম নিজেকে তা ভুলতে দিই না। এখন হুজুরের যা আদেশ।"

দাসের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে সুলতান উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং সস্নেহে তাকে আলিঙ্গন করলেন, আর সভাসদ্‌দের সম্বোধন করে বললেন, "এই মেষপালকের মত জ্ঞান এবং বুদ্ধি তোমাদের একজনেরও নাই। আমি মানুষ চিনি, তা না হলে এই বিশাল সাম্রাজ্য

এত সহজে চালাতে পারতুম না। আরাজকে হিংসা না করে এর মত তোমরা হবার চেষ্টা কর।"

নত মুখে সভাসদেরা দাঁড়িয়ে রইলেন। কারও মুখ থেকে একটি কথাও বের হল না।

অনুশীলনী

১। (ক) আরাজ কে? সুলতানের দরবারে আরাজের প্রতিপত্তি দেখিয়া অন্যান্য সভাসদেরা কি করিলেন?

(খ) দরবার শেষ হইবার পর আরাজ কি করিত? সভাসদেরা আরাজের সম্বন্ধে কি ধারণা করিত?

(গ) সুলতান কি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন? তিনি শেষে কি কি করিয়াছিলেন? কি ভাবে আরাজ সুলতানের সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন?

(ঘ) আরাজের চরিত্রটির যে যে দিকগুলি তোমার ভাল লাগিয়াছে তাহা লিখ।

(ঙ) এই গল্পটির মধ্যে শিক্ষণীয় জিনিসটি কি?

২। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) মূষিকের যা……তাই হবে।

(খ) ভাবলেন এবার চোরটা……শাস্তি হবে।

(গ) অহমিকা এবং দম্ভ……দেবে।

(ঘ) আর আপনার চেয়ে……ভুলে যাবেন।

(ঙ) আমি মানুষ চিনি……পারতুম না।

৩। (ক) শব্দগুলিকে বিপরীতার্থক শব্দে পরিণত কর এবং বাক্য গঠন কর:

উৎফুল্ল, বিশাল, ঘৃণা, প্রকৃত, দম্ভ, বিশ্বাস, তীক্ষ্ণ, চতুর।

(খ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: (চিহ্নিত পদগুলির)

সভাসদদের কথায় সুলতানের বিশ্বাস হল না।

প্রাসাদ ছেড়ে নগর উপকণ্ঠে এক কুটীরে যায়।

Self Consciousness of a Servant.



খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেক দিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রঙের সেকালের বেতের পেঁট্রা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব হাঁড়ী কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব শুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আল্‌না ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তাহারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে।

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ঐ বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির

করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ালে সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারের জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে।…বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন।…পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়।…

তাহাদের ঘরে জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁসিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাটশেওড়া গাছের মাথাগুলা, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বনচালতা গাছের উপর শুইয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ। বড় বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বন-কচু, কটু ওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল,—তাহার মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্রে পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধি মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য, রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এই বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠীর

মাঠ অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এই বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এই বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বনকমলী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁদুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরিষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে।

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের, প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসু হৃদয় কত বিচিত্র কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘনসবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসা-যাওয়া, পত্রপুষ্প-ফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্তী ঝোপঝাপের সঙ্গিহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের সে বিচিত্র, অপূর্ব গভীর আনন্দ-রসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া,—চারিপাশ ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ফুল ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে,—আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোন সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, একসময় কি বিষয়ে সফল-মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির

পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। সে অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোন লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক-একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্ত মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

অনুশীলনী

১। কোন্ জিনিস দেখিয়া কখন অপুর মনে অতীতকালের কথা আসিয়া পড়ে? ঐ সময় সে একা কিভাবে সময় কাটায়?

২। জানালার পাশে যে বন চোখে পড়ে তাহার একটি বর্ণনা দাও।

৩। বনের মধ্যে যে ভাঙা মন্দিরটা দেখা যায় ইহা কোন্ দেবতার? ঐ গ্রামে এই মন্দিরকে লইয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাহা সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

৪। নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখ:

অভ্যন্তরস্থ, অজ্ঞ, দোদুল্যমান, অপারগ, লঘুগতি, গর্বদৃপ্ত, বিবর্ণ, পরগাছা, মরণাহত, আর্দ্র, অফুরন্ত, দ্বন্দ্ব, উদাস, গৃহবিবাগী, অবদান।

৫। পদ পরিবর্তন কর:

জীবিত, মধুর, শ্যামলতা, প্রাচুর্য, বিচিত্র, পাণ্ডুর, সৌন্দর্য, অজ্ঞ।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

সূর্যাস্ত, মনস্কাম, তর্কালঙ্কার, অভ্যন্তর।

৭। চিহ্নিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর:

(ক) <u>একদিন</u> এই <u>ভিটাতে</u> খেলিয়া বেড়াইত।

(খ) <u>পুত্রগর্বে</u> হরিহরের বুক ভরিয়া যায়।

(গ) <u>মুখ</u> ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে।

৮। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাহির কর:

(ক) আমি অপু।

(খ) দেখে বেলা একেবারে নাই।

৯। লিঙ্গ পরিবর্তন কর:

দেবী, বিচিত্র, সূর্য, ঠাকুরদাদা।

———

Some typical welknown scenes of village home and its surroundings.

মানবতাবাদী যোদ্ধা সন্ন্যাসী



সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার

স্বামিজী বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রত্যহ বহু কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষিত যুবক তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী স্বীয় দৈহিক অসুস্থতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যাহাতে এই যুবকগণ, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই বর্ত্তমানে জাতীয়-জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত—ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সেইভাবে জীবনগঠন করিয়া তোলে, তাহার জন্য তিনি ওজস্বিনী ভাষায় সেবা-ধর্মের মহিমা শতমুখে কীর্তন করিতেন। দেশের দুর্দশা আলোচনা করিতে গিয়া সময় সময় ভাবের আতিশয্যে অশ্রুবিসর্জন করিতেন, কখনও বা গম্ভীরভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। অধিকাংশ যুবকের শারীরিক দৌর্বল্য, নৈতিক চরিত্রহীনতা ও আধুনিক কুশিক্ষায় মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া সময় সময় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। "তুই সহস্র বীরহৃদয় বিশ্বাসী চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক এবং ত্রিশ কোটি টাকা হইলে আমি ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারি।" একথা তিনি প্রায়ই বলিতেন

এবং উহার অভাবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে, এমন একটা নিরাশাও সময় সময় তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও ব্যাকুল করিয়া তুলিত। কিন্তু পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন এবং নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাঁহার নিঃস্বার্থ আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে কয়জন জগদ্ধিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই মুষ্টিমেয় নরনারীকেই "অগ্রগামী সৈন্যদল" রূপে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না। ভাবুক সন্ন্যাসী বক্তৃতা, কথাবার্ত্তায় প্রায়ই বলিতেন, "আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়।" এই কারণে স্বামিজী বক্তৃতা প্রদান পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত চেষ্টায় মঠের মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-দিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। একদিন জনৈক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এদেশে আগে জমি তৈরী করতে হবে। পাশ্চাত্যের মাটি খুব উর্বরা। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণমন, রোগশোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার দিয়ে কি হবে? প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন —যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে। ঐ অবস্থার উন্নতি কিরূপে হতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। দেখছিস্ না, পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উঠ্‌বার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা—

সংসার-ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না; শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্ত্তমান

অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌গে,—ভাই সব উঠ, জাগ, কতদিন আর ঘুমুবে? আর বেদান্তের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দেগে। সকলকে বুঝাগে, ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি গৃহস্থ-জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দে গে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক্। জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা। সকলকে এই কথা শোনাগে—তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল। নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?—মুক্তিকামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী কর্‌গে, আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কর্‌তে নরলোকে শরীর ধারণ কর্‌বে—তার ভাবনা নেই। এই দেখ্‌না যারা আগে ভাবতো আমাদের কোন শক্তি নেই—তারাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস্ না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে! আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয় মরেই যাবি। একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। এইভাবে ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা।”

অনুশীলনী

১। (ক) বেলুড় মঠে অবস্থানকালে অসুস্থ অবস্থায় থাকিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষিত যুবকদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লিখ।

(খ) তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয়গুলি কি কি?

২। (ক) কল্পনাপ্রিয় বিবেকানন্দ কথাবার্তা, বা বক্তৃতায় কোন্ কথাটির উপর বিশেষ জোর দিতেন ?

(খ) ভারতের সেবায় যুবকদের কর্তব্য সম্পর্কে স্বামিজীর নির্দেশ যাহা ছিল তাহার পরিচয় দাও।

(গ) বিবেকানন্দের বক্তব্য হইতে ইহাই ধারণা করা যায় যে লৌকিক ধর্ম অপেক্ষা দেশের সেবাকর্মে বিশেষ করিয়া যুবকদের তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন —এই কথাটি কতদূর সত্য যুক্তিসহ দেখাও।

(ঘ) ব্যাখ্যা লিখ : (অ) দুই সহস্র বীর হৃদয়……দিতে পারি।

(আ) আমি এমন এক……মানুষ তৈরী হয়।

(ই) কতকগুলি ত্যাগী……প্রস্তুত হবে।

(ঈ) দেখছিস্ না……শিখেছে।

৩। শব্দার্থ লিখ :

দৃক্‌পাত, ওজস্বিনী, মেধাবী, আতিশয্য, উদ্বুদ্ধ, জগদ্ধিতায়, মুষ্টিমেয়, বেদান্ত।

৪। নিম্নে চিহ্নিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) সেই শক্তি জাগিয়ে তোল। (খ) দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে। (গ) পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে। (ঘ) আমায় কাজে দেখা।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

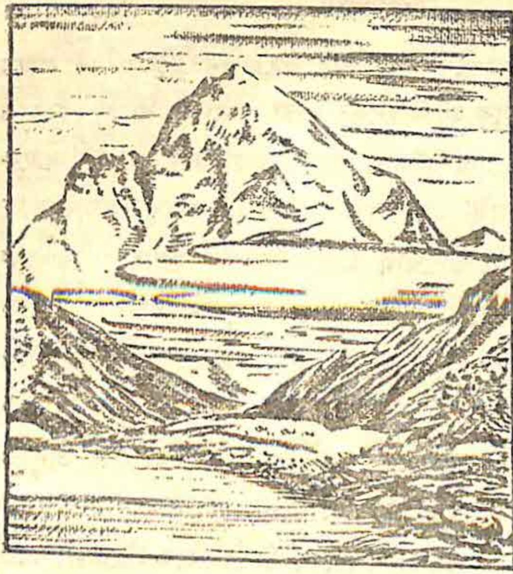
জগদ্ধিতায়, অত্যাবশ্যক, সন্ন্যাসী, উদ্বুদ্ধ, দর্শনার্থী।

৬। শুদ্ধ কর :

শারিরিক, উদ্দেস্য, দক্ষিত, গভির, পুরুস।

———

Some fiery ideals of Swami Vivekanand



মণি মহেশ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সকাল আটটায় যাত্রা। ছয় মাইল দূর—মণিমহেশ হ্রদ।

সকালের শীতের প্রকোপ ত আছেই, তার উপর হিমাচলের তুষার-শীতল বাতাস। চারিদিকের পাহাড়ের মাথায় কাল রাত্রে পড়া আরও নতুন বরফ। সকালের শীতে যেন সাদা চাদর আরও টেনে মাথা মুখ ঢেকে, রোদের আশায় অতি-বৃদ্ধদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা। আমরা চলি প্রথম দিকে কয়েক-পা দ্রুত-পদেই। সহজে শরীরে তাপ নামে। শীতবোধও দূর হয়। কিন্তু সামনেই মণিমহেশের প্রসিদ্ধ শেষ চড়াই। তাই আবার যথারীতি ধীরপদে চলতে থাকি। আকাশ নির্মেঘ। মনেও গভীর আনন্দ। ভাবনা-চিন্তা শূন্য। পাথর বিছানো পথ। কেবলই উঠে চলে। খাড়া পাহাড়, পাথর কেটে ধাপ করা। কোথাও বা পাথরের উপর পাথর সাজানো,—সিঁড়ির মতন। এক এক জায়গায় এক হাঁটুর উপর উঁচু হাতে ভর রেখে উপরের ধাপে ওঠা। কখন কখন আল্‌গা পাথর, অসমানও। অতি সাবধানে পা রেখে উঠতে হয়। কালো বড় বড় শিলা। জল ও বরফের সংস্পর্শে এসে কোথাও বা মসৃণ। উঠবার পথে তেমন ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু

বুঝতে পারি, ফেরবার পথে সতর্কতার প্রয়োজন হবে। এ সময়ে পাথরের উপর মাঝে মাঝে ক্বচিৎ জলের ধারা পেলেও বরফ কোথাও নেই। বৃষ্টির সময় এ পথের দুর্গমতা কল্পনা করা যায় না। বরফে ঢাকা পড়লে হয়ত চলাই যায় না। পথের এই অংশের নামও তাই বান্দরঘাঁটি। মানুষ চলার উপযোগী জায়গা নয়। হাতে পায়ে ভর রেখে ওঠা। তবুও, উঠতে তেমন কিছু কষ্টবোধ হয় না। অতি ধীরে—যতো ধীরেই হোক না কেন—না থেমে এক এক পা করে উঠতে থাকলে অতি দুরূহ চড়াইও এক সময়ে শেষ হয়ই। বান্দরঘাঁটির চড়াইও দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়। পিছনে দূরে দেখা যায়, ডান্‌চুর মালভূমি, ধর্মশালা নদীর শীর্ণ রেখা। ডানদিকে সামনের পাহাড়ের এক অংশের ডান্‌চু নদীর জলধারা পাহাড়ের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে। ওখানে নদীর নাম অমরগঙ্গা। সুন্দর জলপ্রপাত। শেরচাঁদ বলে, যাত্রার সময় ঐ ধারার নীচে মাথা পেতে স্নান করার প্রথা। লোকে বলে একসময়ে জলের তোড়ের মুখে মেয়েরা পাশের পাথর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত, প্রাণও দিত। ঐ ধরণের আত্মদানের নাকি মর্যাদা ছিল, মহান্ পুণ্যকর্ম বলে যাত্রীরা মানত। এখন অবশ্য সে-সব ধারণা গেছে।

বান্দরঘাঁটির পরও আবার চড়াই। ভৈরবঘাঁটি। মনে সংকল্প ও স্ফূর্তি রেখে উঠলে কোন চড়াই অসাধ্য নয়। এ-চড়াইও শেষ হয়। বিশাল এক পাহাড় ধ্বসার অতীত চিহ্ন দেখি। বড় চড়াই-এর পর খানিকটা সমতলভূমি। পথ চলায় পায়ের পাতা সোজা পড়ে, স্বস্তি বোধ করে। কিন্তু, দেহের আরাম, ক্লেশ সবই সাময়িক। সুমুখে আবার পাহাড়ের শ্রেণী। পাথরের পর পাথর। তারই মধ্যে দিয়ে ঘুরে পথ ওঠে। গিরিশ্রেণীর মাথায় আসি। গিরিপথের মত দেখতে লাগে। মনে করি, এই বুঝি চড়াই-এর সমাপ্তি। গুরু-গম্ভীর হিমালয়েরও বিচিত্র পরিহাস-স্পৃহা। উপরে উঠে দেখা যায়—সামনে আরও উঁচু পাহাড়।

হোক আবার চড়াই, মনে ভয়-ভাবনা নেই। পরম আনন্দ জাগে—নতুন জাগতের স্বাদ পেয়ে। বরফের রাজ্যে এসে পৌঁছুই। চারিদিকে শুধু পাথর, বরফ ও জলের ধারা ; নিকটেই ছোট হ্রদ। পাণ্ডা বলে, গৌরী কুণ্ড, এইখানে মণিমহেশ তীর্থযাত্রী সকলেরই স্নান করা বিধি। পথের পাশে তুষার-গলা ছোট নদী। নীল স্বচ্ছ ধারা। জলের ভিতর প্রতি বালুকণাটি দেখা যায়। নদীর উপর ছোট তক্তা ফেলা। সেতুর কাজ করে। ওপরে আবার চড়াই। বিশেষ কিছু নয়। ঢালু পাহাড়ে গা। নতুন পড়া বরফে ছেয়ে আছে। পায়ের চাপে কাঁচের মত বরফ ভাঙে। আনন্দে উঠে চলি। আর অল্প উঠে স্নমুখের ঐ চড়াইটুকু শেষ হলেই মণিমহেশ হ্রদ। শেরচাঁদ বলে, ফিরে তাকান—ওদিকে ঐখানে মণিমহেশ শিখর।

এখন মেঘে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না।

ফিরে তাকাই। দেখি, হালকা ফগ্-এ আচ্ছন্ন সেদিকের দিগন্ত। হিমাদ্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অতি বিষণ্ণ বদনে বলে, কিছুই যে দেখি না ওদিকে! এতো কষ্ট করে আসা,—শেষে কি—

থামিয়ে দিই কথার মাঝে। উৎসাহ দিই, এগিয়ে চলো, ভাবনা কিসের? করুণাময় হিমালয়, যাত্রা কখনই ব্যর্থ হবে না, দেখো।

দেখতে দেখতে হ্রদের ধারে উঠে আসি। বেলা সাড়ে বারোটা। ছয় মাইল পথ—চার ঘণ্টার উপর লাগে আসতে। হ্রদের নিকটে নতুন ফরেস্ট-বাংলো। সবে সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমাদ্রি বলে, এর কথা ত কেউই বলেনি। জানা থাকলে এইখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা যেতো। এ-যে স্বর্গরাজ্য!

প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে হ্রদ। মাইলখানেক হয়ত পরিধি। চারিপাশে বরফের পাহাড়। হ্রদের তীরেও মাঝে মাঝে বরফ পড়ে। হ্রদের জলের উপরও তুষার আচ্ছাদন, কোথাও মনে হয় আধ ইঞ্চি পুরু হবে। যেন ঘন দুধের উপর সাদা মোটা সর। কোথাও কোন মন্দির নেই, দেব-মূর্তিও নেই। হ্রদের একপাশে জলের নিকটে

মাটিতে কয়েকটি ত্রিশূল পোঁতা। শেরচাঁদ বলে, যাত্রীদের রেখে যাওয়া। যাত্রার সময় যাত্রীরা হ্রদের তীরে তাঁবু খাটায়। সারারাত ভজন ও কীর্তন চলে। গদ্দীরা দলে দলে বহু ভেড়া বলি দেয়।

দেখি তাই, ভেড়ার শিঙ অনেক ছড়িয়ে আছে চারিধারে।

হ্রদের আশেপাশে ঘুরে ফিরে দেখি। হ্রদেরও উপর মেঘের ম্লান ছায়া।

হঠাৎ মেঘ চিরে রোদ ফোটে। হ্রদের ও চারিদিকের শুভ্র তুষারের লক্ষ-প্রদীপে আলোক শিখা যেন কাঁপতে থাকে।

হিমাদ্রি উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, দেখুন, দেখুন—তাকিয়ে দেখুন।

সামনের ফগ্ অকস্মাৎ উড়ে চলে। দিগন্তের আবরণ মুক্ত হয়। যেন দেবতার মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ার খোলে।

চারি পাশের তুষার-কিরীট গিরিপ্রহরী। তারই মাঝে নীল আকাশে মাথা তুলে, মণিমহেশ-শিখর। সবার মধ্যে বিরাজ করেও স্বতন্ত্র। উন্নত-শির, ধ্যান-গম্ভীর। ত্রিকোণ আকৃতি।......

সাগরবক্ষ থেকে ১৮,৬৫৪ ফুট উঁচু। শিখরের গায়ে কোথাও তুষার, কোথাও বা পাথর। যেন পূজা-শেষে শ্বেতপদ্ম ও বিল্বপত্রের পুষ্পাঞ্জলির নিদর্শন। পাথরগুলি এমনি বিচিত্রভাবে সাজানো, দেখায় যেন শিখরের গায়ে সহস্র ত্রিশূল গাঁথা। কোথাও বা মনে হয় জীব-জন্তুর আকার। চূড়ার অনেক নীচে তুষারাবৃত সেই ধরণের কয়েকটি পাথর দেখিয়ে শেরচাঁদ বলে, ঐ হলো গদ্দী, ভেড়া, মহাত্মা, কাক ও সাপের পাথরে পরিণত মূর্তি।

তিব্বতে কৈলাস-শিখর যেমন দেবতার প্রতীক, এখানেও তেমনি মণিমহেশ। তারই পাদদেশে তুষার-গলা নির্মল হ্রদের প্রশান্ত বিস্তৃতি। যেমন, কৈলাসের কোলে গৌরী কুণ্ড।

হ্রদের একপাশে একটি পাথরের উপর একা স্থির হয়ে বসি। অদৃশ্য নিম্ন-উপত্যকা থেকে আবার পুঞ্জীভূত মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। মণিমহেশের অঙ্গ ঘিরে ধীরে বায়ু ভরে ওঠে। দেখায় যেন

বেদিমূল থেকে ধূপ-ধুনার ধুম ঘুরে ঘুরে ওঠে। মণিমহেশ সেই ধুমের আবরণে অদৃশ্য হন। বাতাসে সে ধুমরাশি পুনরায় ভেসে যায়। মণিমহেশও আবার প্রকাশ পান। সূর্যের আলো পড়ে, রূপার অলঙ্কারে সজ্জিত-দেহ গিরিরাজ উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করেন। হ্রদের অপর অংশে স্বচ্ছ জলে মণিমহেশের প্রতিবিম্ব কাঁপে।

শব্দহীন মহান্ নিস্তব্ধতা। স্বর্গীয় অনুপম শোভা। শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন বিরাট হিমালয়। একদৃষ্টে দেখতে থাকি। আবার হারিয়ে যাই অসীমের মাঝে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধন, যশ, মান, অভিমান সবকিছুই নিরর্থক মনে হয়। অতি স্নিগ্ধ সুগভীর প্রশান্তি অন্তর উজ্জ্বল করে রাখে। হিমালয়-পথের এই অপার্থিব অমূল্য দান নতশিরে প্রাণভরে গ্রহণ করি।

অনুশীলনী

১। (ক) মণিমহেশ কি এবং কোথায় ?

(খ) মণিমহেশে লেখক যেভাবে গিয়াছিলেন সেই যাত্রাপথের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। মণিমহেশ ও ইহার চারিদিক্‌কার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দাও।

৩। সপ্রসংগ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) যেন ঘন দুধের……মোটা সর।

(খ) হঠাৎ মেঘ চিরে ····কাঁপতে থাকে।

৪। বিপরীত পদে পরিণত কর :

প্রশান্তি, নতশির, স্নিগ্ধ, অদৃশ্য, আবরণ।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

নির্মেঘ, অতীত, দুর্গমতা, দুরূহ, স্বস্তি, আচ্ছন্ন।

৬। স্বরচিত বাক্য গঠন কর :

অপার্থিব, অমূল্য, অনুপম, অসীম, প্রশান্ত।

Description of a Himalayan Region.

দ্বীপান্তরের কারাকক্ষে

সতীশ পাকড়াশী



আলিপুর জেল থেকে আমরা ১৬ জন সরকার প্রদত্ত ছেঁচা লোহার এক এক জোড়া বেড়ী পরে সাগর তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য যাত্রা করলাম। সিপাই শান্ত্রীরা বন্দুক নিয়ে এসেছে দলে দলে—জাহাজে চড়ে আমরা যাব কালাপানি—আন্দামান দ্বীপে, যেখানে কলকাতা থেকে মাসে একদিন একখানা জাহাজ কয়েদী নিয়ে যায়।

“মহারাজা” ষ্টীমার ডায়মণ্ডহারবার ছেড়ে যতই দক্ষিণে সাগরাভিমুখে যেতে থাকে ততই মনে অভূতপূর্ব পুলক, বিস্ময় ও কৌতূহল জাগে কোথায় কোন্ অজানা রাজ্যে যাচ্ছি! রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট বরফের দেশ সাইবেরিয়ায় রাজবন্দীদের নির্বাসনে পাঠাত। ইংরেজ পাঠায় দ্বীপান্তরে—যেখানে স্বাস্থ্য নেই, খাদ্য নেই, বিশ্বজনের সঙ্গে সংযোগ নেই।

দুস্তর জলরাশির মাঝখানে বন্দী ষ্টীমারেও আমরা বন্দী—ডেকের একটি তালাবন্ধ প্রকোষ্ঠে আমাদের স্থান। শোয়া-খাওয়া এখানে। মলমূত্র ত্যাগের ঝঞ্ঝাট কম নয়, বেড়ির উপরে আবার হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধা চাই। সিপাই দড়ি ধরে পায়খানায় নিয়ে যাবে।

সকালে বিকালে সকলকে উপরে নিয়ে যেত হাওয়া খাওয়ার জন্যে। বিশাল সমুদ্রের কূল কিনারা কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে গোলাকার হয়ে আকাশ ঢলে পড়েছে সমুদ্রের গায়। দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কল্পনার মানচিত্রে দূর মেরু সাগর চোখে ভাসে। বিস্মিত হয়ে ভাবি—সে কত দূর! সন্ধ্যাবেলায় রাঙা সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যায় অগাধ জলরাশির মাঝখানে, সবুজের সুন্দর দৃশ্য আঁধারে হাহাকার করে ওঠে; আমাদের টেনে নিয়ে যায় সিপাই'র দল। ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হই উপরে ওঠার আশায়।

সমুদ্রের বুক থেকে প্রকাণ্ড সূর্য লাল হয়ে ধীরে ধীরে ওঠে। তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি। ভুলে যাই বন্দীজীবনের কথা। সিপাই'র দল আবার টেনে নিয়ে যায় ডেকে—আলো বাতাসহীন গরম প্রকোষ্ঠে। প্রতিদিন বিপদ সংকেত বাজে। চারটে বয়া বুকে কাঁধে বেঁধে লাইন করে দাঁড়াই, ক্যাপ্টেন সাহেবও গলায় কি একটা সুন্দর জিনিস লাগিয়ে আসে পরিদর্শন করতে। পরে জানলাম, ক্যাপ্টেন সাহেবের গলায়ও বয়া। জাহাজ ডুবলে ওতে ভর করেই সাহেব মরণের বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের গলার বয়া অত বিশাল ও কদাকার কেন? ভাবলাম মরণেরও শ্রেণীভেদ আছে নাকি? চারদিনের পর আন্দামানে পৌঁছলাম।

সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ১৯৩: সালের এপ্রিল মাসে আমরা ১৭ জন পোর্ট ব্লেয়ার সেলুলার জেলে প্রবেশ করি। কয়েক মাস পূর্ব হতেই প্রতি জাহাজে বাংলা থেকে বন্দীদের আনা হচ্ছিল।

* * *

বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের সেরা বিপ্লবীদের এখানে এনে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। বাঙালী ছিল শতকরা নব্বুই জন। তিনশো রাজবন্দীকে নির্বাসন দিয়েও একত্রে থাকার সুযোগ না দেওয়াতে মনটা দমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত—দেখা করা বা সংবাদ আদান প্রদানের সুযোগটুকু

অবধি নেই। কবুতরের খোপের মতো সার বাঁধা ছোট ছোট খোপ, তারি একটিতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। বাতি নেই ভিতরে। পায়খানার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রস্রাবের জন্য একটি মাটির টোপা আছে। খেলা বা ব্যায়ামের ব্যবস্থা নেই। জাল বোনার জন্য নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি পাকানোর কাজ আছে। তিনটে বাজার পরেই জমাদার এসেই মুশাক্কৎ মুশাক্কৎ বলে চেঁচাতে থাকে ; মানে যার যার খাটুনি নিয়ে এসো। আমরা কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। খবরের কাগজের অভাবটাই আমাদের বড় লাগে।

—সাপ্তাহিক স্টেট্‌সম্যান, ওভারসি সংস্করণ পড়তে পাই বটে, তা ছিল ক্ষীণ আলো দিয়ে নিষ্প্রদীপের দুর্নাম ঢাকার চেষ্টা মাত্র। বিকালে ৫টা বাজতেই নিজ নিজ সেলে গিয়ে তালাবন্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার ঘন্টা বাজে। গ্রীষ্মকালের বেলা তখনও অনেক বাকি থাকে। পরদিন সকাল প্রায় ৭টায় তালা খুলে দিত, দীর্ঘ ১৪ ঘন্টা তালাবন্ধ আলোকবাতাসহীন ক্ষুদ্রকক্ষে দিনগুলি কাটতো। লেখার কোন বিধান নেই বলে খাতাপত্র পাওয়া যায় না।

...স্বাস্থ্যের কথা—মশা আছে, মশারি নেই, ম্যালেরিয়া বেশ আছে। পানীয় জল খারাপ, কাজেই আমাশয় লেগেই আছে। বিষাক্ত পোকা-মাকড়, বিচ্ছু, তেঁতুলবিছেতে সেলগুলি ভরা। ঘর ধুয়ে ঝেড়ে কিছুই প্রতিকার হয় না, পুরানো দেয়ালের মাঝে তাদের বাসা। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি। জলের অভাব নিদারুণ। অনেক দিন স্নান না করে অথবা মাথায় খানিকটা জল দিয়ে রয়েছি, তাও বহুক্ষণ বসে থাকার পর সুযোগ পাওয়া যেত। কোনদিন খাওয়ার জল নেই, কোনদিন বা জল না-পাওয়ায় রান্না হতে দেরী হয়ে যেত। এ নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকতো। তারা মনে করতো কয়েদির আবার এত দাবী-দাওয়া কেন? চৈত্রমাসের রোদে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম একটু জলের জন্য। খাবার তরি-তরকারি ভাল নয়। আলু মাসে একবার আসে কলকাতা থেকে, সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। ওখানে

ভাল চাল হয় না, কাজেই ভাল ভাত জুটবে কোত্থেকে? সমুদ্রের বড় বড় মাছ পাওয়া যেত ; তা দেখে খাওয়ার রুচি থাকে না, খেলেও স্বাদ লাগে না। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য মানুষের খাওয়ার উপযোগী ছিল না। ফ্যানের মতো ভাত, ঘাসের তরকারি, অসিদ্ধ বিস্বাদ ডাল আর তেতো আটার রুটি। তাতে স্বাস্থ্য কেউই ভাল রাখতে পারেনি। আবেদন, নিবেদন ও নালিশের পর অনশন করাই স্থির হয়।

১৯৩৩ সালের মে মাস। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক নেতারা জেলে বন্দী। আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, সরকারী নিষ্পেষণে সবাই দুর্বল। এমন সংকটের সময়ে আন্দামান সেলুলার জেলে সুরু হোল অনশন ধর্মঘট। খাদ্যাভাব, শিক্ষা ও সংবাদের অভাব, স্বাস্থ্যাভাব এত সব অভাব ও দুর্গতি নিয়ে তিল তিল করে মরণের চেয়ে জীবনের সাধনায় এমনি করে একেবারে মরাই ভাল। এমনি দৃঢ়তা নিয়ে সকলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজবন্দীর দুর্বহ জীবনযাত্রা পরিবর্তনের চেষ্টায় যতীনদাস লাহোর কারাগারে জীবনাহুতি দিয়েছে। যতীনদাসের আত্মদান ব্যর্থ হতে দেব না।

বন্দীর জেলসংগ্রাম স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই অপরিহার্য অঙ্গ। এখানেও আমরা সংগ্রাম-পথযাত্রী। সুতরাং এ বিষম অবস্থায় অনশনই একমাত্র সংগ্রামের উপায়।

অনশনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। সারাদিন একজনকে এক এক কুঠরীতে তালা বন্ধ করে রাখে। যাতে আমরা মরে না যাই সেজন্যে জোর করে রবারের নল দিয়ে পেটে দুধ প্রবেশ করিয়ে দিত। সীমান্তের দীর্ঘকায় দুর্দান্ত প্রকৃতির পাঠান কয়েদীরা আমাদের দু'পায়ে, দু'হাতে মাথায় ও বুকে চেপে ধরতো ; ডাক্তার দীর্ঘ একটি নল নাসারন্ধ্র দিয়ে গলার খাদ্যনালী অবধি প্রবিষ্ট করিয়ে নলের মুখে দুধ ঢেলে দেয়।

একটু মাথা নাড়লেই ব্যথা পাই। ডাক্তারের তাড়া হুড়োতে কতজনের নাসারন্ধ্রে ঘা হয়ে যেত। এমনি নিষ্ঠুরভাবে খাওয়ানোর ফলে আমাদের তিনটি বন্ধু একে একে মারা যায়—মোহিত মৈত্র, মোহনকুমার দাস এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার মহাবীর সিং। এঁদের মৃত্যুর পর অনশনকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। সরকারী অবহেলায় তিনটি স্বদেশপ্রাণ যুবকের জীবন শেষ হয়ে গেল। কেউ জানলো না, কেউ তাদের পবিত্র দেহের সংকার করলো না, বিদেশে বিভুঁইয়ে কালাপানির কালো জলে তারা ডুবে গেল। মুক্তি-সংগ্রাম বিজয়ের দিনে বীর শহীদের বেদীমূলে এদের আত্মদান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আন্দামান জেলে তিনজন রাজবন্দীর মৃত্যু-সংবাদে ভারতে বিপুল আন্দোলন হয়। ভারতের গভর্ণমেন্ট তদারক করার জন্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল বাকারকে পাঠান। এরই মধ্যে আমাদের উপর অত্যাচার চরমে ওঠে। অনশনের মধ্যে একবার দুবার জলপান করতাম। কারুর বা দেড়মাস, কারুর বা একমাস অনশনে থাকার পর সরকারী নির্দেশে জল দেওয়া নিষিদ্ধ হল। নিরঞ্জন সেন ও সুধেন্দু দাসের নাড়ী পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তাদের চিকিৎসার নামে পৃথক স্থানে নিয়ে যায়। হীরামোহন নামে একটি ছোট ছেলেকে নীরব ও নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডাক্তার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেন: “কেমন—এবার অনশন ছাড়বে? ছেলেটি উত্তর দেয়,: “কেন? জল বন্ধ করেছেন বলে মরণও বন্ধ করতে পারবেন কি?”

আমি নিজেও তখন জীবনের আশা ছেড়ে দিই। কিন্তু ধর্মঘট শেষ অবধি জয়যুক্ত হবে—এ বিশ্বাস খুবই ছিল। প্রায় দু’মাস পর কর্নেল বাকার সাহেবের বিবেচনার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমরা অনশন ভঙ্গ করি। এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের প্রায় সকল দাবি পূর্ণ করে দেওয়া হয়। তিনটি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে রাজবন্দীর মহার্ঘ দাবি আদায় করা সম্ভব হয়।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। আন্দামান দ্বীপটি কোথায়? এখানে রাজনৈতিক বন্দীদের পাঠান হইত কেন? আন্দামানের জেলখানাটির নাম কি?
এই প্রবন্ধের লেখক কে? তিনি কেন আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন?

২। লেখককে আন্দামান যাত্রাপথে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

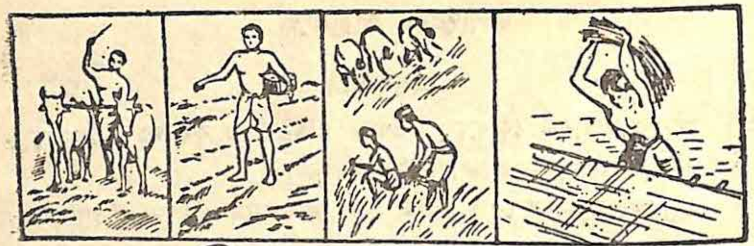
৩। আন্দামানে রাজবন্দীরা কিরূপ জীবন যাপন করিতেন? তাঁহাদের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষ কিরূপ ব্যবহার করিতেন? জেলে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৪। দ্বীপান্তরের রাজবন্দীরা আমরণ অনশন করিয়াছিলেন কেন? তাঁহারা ভারতের কোন্ বিপ্লবীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন? অনশনকালে তাঁহাদের উপর কিরূপ অত্যাচার হইয়াছিল? এই অনশন আন্দোলনের ফলাফল কি হইয়াছিল?

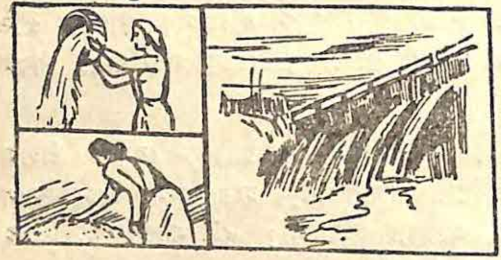
৫। ব্যাখ্যা লেখ:
(ক) ভাবলাম মরণেরও শ্রেণীভেদ আছে নাকি?
(খ) খাদ্যাভাব, শিক্ষা······একেবারে মরাই ভাল।
(গ) যতীন দাসের আত্মদান ব্যর্থ হতে দেব না।
(ঘ) কেন? জল······পারবেন কি?

৬। টীকা লিখ:
সেলুলার জেল, দ্বীপান্তর, সাইবেরিয়া, বয়া, মুশাক্কৎ, সেল, ওভারসি সংস্করণ, আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যতীন দাস, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, নিরঞ্জন সেন।

Experiences of a patriot in the cellular jail.



কৃষিকাজে ভারত



সুরেশ মৈত্র

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—তার অর্থ এই নয় যে কৃষি প্রাধান্যের জন্য ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের সুপ্রতুলতা আছে। আজও সংবাদপত্রে লেখা হয় যে, অদ্যাবধি ভারতবর্ষের লোক গাছের শিকড়, গুগ্‌লি, শামুক খেয়ে দেহধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ যন্ত্রসভ্যতা ভারতবর্ষে দুশো বছর পূর্বে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ভারতের শিল্প প্রসার আশানুরূপ হয়নি। তার কারণ কি? ভারতের অধিবাসী কি বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি? ভারতের জনগণ কি পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থা বেশী পছন্দ করে? দুটো প্রশ্নেরই জবাব হোল এক।

ভারত শিল্পে অনগ্রসর থেকেই গেছে—তার কারণ ভারতবর্ষ ছিল একটি বিদেশী শক্তির শাসনাধীন। ঐ শাসকশক্তি তার নিজের স্বার্থে ভারতবর্ষে শিল্প উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা করেছে। শুধু পাট ও বস্ত্রশিল্পে ভারতে কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও প্রভুত্ব করেছে বিদেশী পুঁজি। ভারতবর্ষের জনগণ পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার অনড়ত্বের দরুণ বহু বৎসর এক দুঃসহ জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে।

শুধু খাদ্য নয়, তার যানবাহন ব্যবস্থা, তার জনস্বাস্থ্য, তার শিক্ষা-ব্যবস্থা—সর্বত্রই শিল্প-অনগ্রসরতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাই ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এই কথা বলে গর্ববোধ করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। আজ শিল্প-উন্নয়ন ব্যতীত চাষ-আবাদেরও অগ্রগতি নেই। বর্তমানে কৃষকের হাল, বীজ, জলসেচ প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণের উন্নতির জন্য যন্ত্রসভ্যতার সবল হাত মেলাতে হবে। ভারতবর্ষ একটা প্রাচীন দেশ কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়ে থাকা সমীচীন নয়, হিতকরও নয়।

কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছে খাদ্য। খাদ্য ব্যতীত দেহধারণ সম্ভব নয়। আদিম যুগে মানুষ অরণ্য থেকে ফলমূল আহরণ করত, খাল বিল নদী থেকে মাছ, শামুক, গুগ্‌লি, কচ্ছপ আহরণ করত। তারপর পাথরের অস্ত্র ব্যবহার শিখলে, জন্তু জানোয়ার শিকার করে সে তার খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হোল।

এই অবস্থা মানব-সভ্যতার আদিম অবস্থা। মানুষ ধীরে ধীরে খাদ্য সংগ্রহের এই আদিম স্তর থেকে খাদ্য-উৎপাদনের স্তরে উপনীত হোল। সে শিখল জমিতে কেমন করে চাষ করতে হয়। সে ফসল বুনতে শিখল, ফসল তুলতেও শিখল। কোন শিক্ষক তাকে শিখায়নি, অভিজ্ঞতাই তাকে শিখিয়েছে। খাদ্য উৎপাদন করতে শিখে মানুষ তার যাযাবার জীবন ত্যাগ করল। এখন থেকে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইল। স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য সে নদীতীর বেছে নিল। কারণ প্রথমতঃ এর ফলে সেচের সুবিধা হোত; দ্বিতীয়তঃ আর একটি সুবিধা ছিল, সেটা হোল যাতায়াত। স্থায়ী বসবাস থেকে সমাজ জীবন গড়ে উঠল; মানবসভ্যতার বিকাশ সুরু হোল।

কৃষি থেকেই মানুষ তার খাদ্যের শতকরা ৯৯ ভাগ উৎপাদন করতে শিখল, মাত্র একভাগ থাকল সংগ্রহনীতির উপর। পৃথিবীর একভাগ লোক কেবল প্রকৃতিদত্ত খাদ্যের উপর নির্ভর করে। তারা এখনও

অনুন্নত। পূর্বে বলেছি ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনাধীন ছিল। এই কারণে এদেশের লোক কৃষিকাজে যন্ত্র সভ্যতার সহায়তা সন্তোষজনকভাবে নিতে পারে নি। দেশ বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পেলে কৃষির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। জমিদারি প্রথার বিলোপ হোল। জমির উপর চাষীর স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল। বর্গাদারের অধিকারও ভাগচাষের জমির উপর অংশতঃ স্বীকৃত হোল।

কৃষিব্যবস্থায় যে কোন প্রকার প্রগতিমূলক নীতি অনুসরণ করতে হলে কৃষকের সহযোগিতা দরকার। আর কৃষকের সহযোগিতা ব্যতীত নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ ঘটতে পারে না। ফসল উৎপাদন আজ প্রকৃতির খেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটান হয়ত ভারতবর্ষে অনেকটা আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হবে। কিন্তু বৃষ্টির জল ধরে রেখে তাকে সুষমভাবে বণ্টন করা আদৌ আজগুবি ব্যাপার নয়। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, নাগার্জুন ও কোশী পরিকল্পনা, হীরাকুঁদ বাঁধপ্রকল্প, ময়ূরাক্ষী প্রকল্প—সবগুলিই ভারতের কৃষিউন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত। এই সব পরিকল্পনা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কম নয়। কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়ে কৃষিকাজে যে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার গুরুত্বও অসামান্য। এছাড়া আরও নানাবিধ খাল খনন করে জলসেচের সুব্যবস্থা করার উদ্যোগ হয়েছে। জলসেচ প্রয়োজন বীজ বপন করার পর কিন্তু বীজ বপনের পূর্বে প্রয়োজন মাটি চাষের যোগ্য করা। এর জন্য আমাদের দেশে মান্ধাতা আমলের হাল বলদ আজ আর গ্রহণ-যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর আজ ভারতের নানা খামারে দেখা দিতে সুরু করেছে। কলের লাঙ্গলের সাহায্যে বীজ বপন করাও সম্ভব। এমন কি ফসল কাটার কাজও যন্ত্র করছে। এর ফলে মানবশ্রমের অপব্যয় হ্রাস পাচ্ছে।

বীজ ছড়ালে, তাকে পরিচর্যা করলে চারা উঠে ; এই চারা পর্যায়

রোদ বৃষ্টি হাওয়া পেলে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে এবং একদা শস্যের ভারে নুয়ে পড়ে। কিন্তু বীজ বপন করার পূর্বে এই বীজ পুষ্ট কিনা, বীজাণুমুক্ত কিনা, এসব পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষেত্রেও আমাদের সাহায্য করেছে। মানবশিশুর মত এই উদ্ভিদ্ শিশুও বিজ্ঞানের পরিচর্যায় নিয়ত বৃদ্ধিলাভ করে। বীজ বপন করার পূর্বে যেমন বিজ্ঞান তার উপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়, বীজ যেখানে বর্ধিত হয়, সেই জমিও আবাদের যোগ্য কিনা, তা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়।

একই জমিতে ফসল আরও কতবার উৎপন্ন করা যায় এবং কত কম খরচে করা যায়, এ দিকটির প্রতিও বিজ্ঞান কৃষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। টুকরো টুকরো খামার যে অধিক ফসল ফলাবার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করে, এবোধ জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু চাষী এ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে পারছে না। এদেশে জমির মালিকানা স্বত্ব যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে জমি খণ্ড খণ্ড হবার পথ প্রশস্ত হয়ে আছে।

জমি তৈরী করে ফসল বপন করলেই যথেষ্ট ফসল ফলবে, এরূপ আশা করা যায় না। জলসেচ পর্যাপ্ত হলেও যে জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হবে, এটাও আশা করা যায় না। আশানুরূপ ফসল ফলনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ।

ভারতবর্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে সার উৎপাদন হচ্ছে। এখন জৈব সারের উপর আর আমরা ভরসা করছিনা—ভরসা করছি রাসায়নিক সারের উপর। সিন্ধ্রী ও দুর্গাপুর সার কারখানা সার সরবরাহ করছে। অবশ্য চাহিদার তুলনায় তার পরিমাণও খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

পৃথিবীর বহুদেশে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকীকরণ ঘটে গেছে। ভারতবর্ষ এখনও এক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হতে পারেনি; তবে তার উৎসাহ আছে। আজ ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রাম নানা উন্নতিমূলক কর্মসূচীর আওতায়

এসেছে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে সমগ্র গ্রামজীবনকে পরিবর্তিত করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জমি তৈরী, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ, উপযুক্ত গরু বলদ এবং চাহিদা অনুযায়ী কলের লাঙ্গল পর্যন্ত জোগান দেওয়া হচ্ছে।

বাঁচার জন্য খাদ্য চাই, তবে খাদ্যের জন্য বাঁচা নয়। তাই জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে শুধু খাদ্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়নি ; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি—সব কিছুর মান উন্নয়নের জন্য এক যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একেই বলা হয়েছে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ভারতবর্ষে পুরাতন আর্থিক ভিত্তি ভেঙ্গে পড়েছে ; নতুন ভিত্তি গড়বার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। শুধু চাষী নয়, ভারতের গ্রামে গ্রামে চাই নতুন নাগরিক, যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির শুধু স্বপ্ন দেখবে না, সংগ্রাম করবে, এককভাবে নয়, সম্মিলিতভাবে।

অনুশীলনী

১। "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—অথচ এই দেশের লোক খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পায়"—ইহার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। মানুষ সমাজ জীবনে কি ভাবে আসিয়াছিল তাহার পরিচয় দাও।

৩। লেখক কৃষি ব্যবস্থায় যে সমস্ত প্রগতিমূলক নীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

৪। অধিক ফসল উৎপাদনে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা উপযোগী তাহা লিখ।

৫। (ক) শব্দার্থ লিখ :

সুপ্রতুলতা, পুঁজি, প্রতিবন্ধকতা, প্রভুত্ব, অনড়ত্ব, উপবীত, অনগ্রসরতা, সমীচীন, আহরণ, অনুপ্রবেশ, সংগ্রহনীতি, প্রগতিমূলক, স্বত্ব।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

পর্যাপ্ত, যথেষ্ট, উদ্যোগ, উন্নয়ন, যাতায়াত।

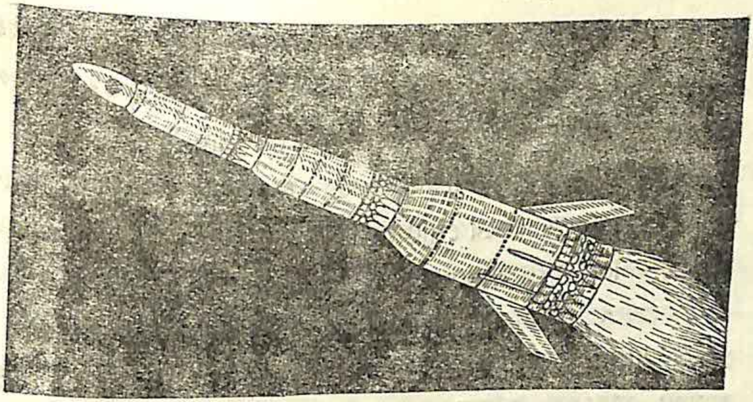
(গ) বিপরীতার্থক রূপ লিখ :

অনগ্রসর, স্থায়ী, সংগ্রহ, সুরু, হ্রাস, কৃত্রিম।

(ঘ) পদান্তর কর :

প্রয়োগ, বপন, গ্রহণ, মৌল, জাতীয়, আকর্ষণ, উন্নয়ন।

India in agriculture



চন্দ্রাভিযান

অরবিন্দ মণ্ডল

মানুষের মন এক অদম্য কৌতূহলে ভরা। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার সাধনায় সে চিরপথিক। ঘরের সীমানা পেরিয়ে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে তার অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে চিরকাল। তুষারাবৃত দুর্গম পর্বতে, অকূল দরিয়ায়, জনশূন্য মরুতে, গহন অরণ্যে সর্বত্রই তার পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে একটির পর একটি ক'রে। কিন্তু এতেও সে ক্ষান্ত নয়। অসীম নীলাকাশ, অগণিত গ্রহ-তারা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুদূরের এই আহ্বানে মানুষ তাই পৃথিবী ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে অনন্ত মহাকাশের পথে।

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। এখানে অভিযান করাই মানুষের প্রথম লক্ষ্য। বারংবার চেষ্টা করার পর ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই মানুষ প্রথম পদার্পণ করল প্রাচীন চন্দ্রের মাটিতে।

মানুষের চন্দ্রে পদার্পণের মূলে আছে কৃত্রিম উপগ্রহ-সৃষ্টি ও মহাকাশে তার বিচরণ। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ১৯৫৭ সালে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করলেন। সাফল্যের সঙ্গে এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে পৃথিবীর চারদিক প্রদক্ষিণ করল। এই হ'লো মহাকাশ-বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ। ঐদিন হ'তেই মানুষের সামনে উন্মোচিত হ'লো নতুন উষার এক স্বর্ণদ্বার। এরপর রাশিয়া ও আমেরিকার

দুঃসাহসিক নভশ্চররা বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন এবং সুস্থ দেহেই আবার পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছেন। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাশূন্যে সর্বপ্রথম পাড়ি দিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার য়ুরি গ্যাগারিন। এরপর কয়েকজন রুশ ও মার্কিন নভশ্চর মহাকাশযানে মহাশূন্যে বিচরণ করেছেন, চন্দ্রের অভিকর্ষে পৌঁছেছেন এবং দূর থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

অবশেষে বৈজ্ঞানিকদের বহুদিনের আশা ফলবতী হ'তে চলল। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই। আমেরিকার তিনজন নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডুইন অলড্রিন অ্যাপোলো ১১-তে আরোহণ করে যাত্রা করলেন চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে। মর্ত্য-মানুষের প্রথম পদচিহ্ন চন্দ্রের বুকে অঙ্কন করবেন—এই তাঁদের একান্ত কামনা। মহাকাশ যানটি ঘণ্টায় ২৪ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলল প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরবর্তী চন্দ্রের দিকে।

আড়াই ঘণ্টা ধ'রে অ্যাপোলো ১১ পৃথিবী পরিক্রমা করল। তারপর এর গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো। পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চন্দ্রের পথটি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা ভালভাবেই চলেছেন।

মহাকাশে মূল মহাকাশযান থেকে 'ঈগল' নামে চন্দ্রের ভেলাটিকে বের করলেন নভশ্চররা। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে ঈগল চন্দ্রের দিকে ছুটে চলল। তারপর ২০শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ৪৯ মিনিটে উহা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করল। কোনরকম আঘাত লাগল না মহাকাশচারীদের শরীরে। চারটি পা ছড়িয়ে দিয়ে ঈগল বেশ শক্তভাবেই দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রের বুকে একটা সমতল ভূমির ওপর। ঠিক ছিল, পরদিন অর্থাৎ ২১শে জুলাই দুই মহাকাশচারী ভেলা থেকে বের হ'য়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে বেড়াবেন। প্রথমে নামবেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রং, তারপর তাঁর অনুগমন করবেন অলড্রিন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৬ মিনিট

২০ সেকেণ্ডে আর্মস্ট্রং ঈগলের ঢাকনি খুলে মই বেয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামলেন। কিছুক্ষণ পর নামলেন অলড্রিন।

পৃথিবীর মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এই চরম মুহূর্তটির জন্য। চন্দ্রে অবতরণের সংবাদ এল পৃথিবীতে। বিশ্ববাসী মহানন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে মানুষ চন্দ্রের বুকে প্রথম তার পদচিহ্ন অঙ্কন করল। যুগযুগান্ত অতিক্রান্ত হলেও মানবজাতি কখনই এই দিনটির কথা ভুলতে পারবে না। মহাশূন্যে চন্দ্র এই স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে জেগে থাকবে অনন্তকাল।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ক'রে তাঁরা দেখলেন, চন্দ্রের বুকে ছোট ছোট আয়তনের গর্ত আর অসংখ্য নুড়িপাথর ছড়ানো। চারিদিকে কেমন ছায়া ছায়া ভাব অথচ সুন্দর দৃশ্য! মাটি যেন কয়লার গুঁড়োর মতো। প্রথমেই যে নুড়িপাথরটি সামনে পাওয়া গেল, তা-ই কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে তুললেন আর্মস্ট্রং। তারপর সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে প'ড়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন টলতে টলতে। ঠিক ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে। অল্পক্ষণ পর চন্দ্র-জয়ের স্মারক ফলকটি এবং মার্কিন পতাকাদণ্ড পুঁতে দিলেন। ফলকে লেখা ছিল—'১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর গ্রহ থেকে মানুষ এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিল। আমরা এসেছিলাম সমগ্র মানবজাতির শান্তি-কামনায়।'

এরপর শুরু হ'লো বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম। মাটির নীচে সিসমোমিটার যন্ত্র বসিয়ে দিলেন—ভূকম্পনের মতো চন্দ্রকম্পন তাতে ধরা পড়বে। লেশার রিফ্রেকটর বসানো হ'লো। এই যন্ত্রটি পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব নির্ভুলভাবে মাপবার সুযোগ দেবে। চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু ছবি তোলা হ'লো। তারপর ভারতীয় সময় ১০টা ৩০ মিনিটে অলড্রিন ভেলায় গিয়ে উঠলেন। বিশ মিনিট পরে তাঁকে অনুসরণ করলেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রং। চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করবার পূর্বে তাঁরা থলি ভ'রে

বেশ কিছু মাটি ও পাথর কুড়িয়ে নেন। ভেলায় উঠে দুজনে আহার করলেন। আহারের শেষে নিদ্রাও হ'য়ে গেল। ভেলাটি চন্দ্র পরিক্রমা করতে শুরু করল। তারপর কলিন্স-পরিচালিত মূল মহাকাশ যানের সংগে 'ঈগল' মিলিত হ'য়ে তিনজনে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করতে থাকেন। ২৫শে জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তারা নেমে পড়েন এবং পূর্বের ব্যবস্থামতো উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার এসে নভশ্চরদের নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে চন্দ্রাভিযান এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। সৃষ্টির উষালগ্ন হ'তে আজ পর্যন্ত যা ছিল আমাদের কল্পনার বস্তু, স্বপ্নের জিনিস, তা আজ মানুষের দ্বারাই বাস্তবে পরিণত হ'লো। একনিষ্ঠ সাধনায় কিছুই অসম্ভব নয়—মানুষ যুগে যুগে তা প্রমাণ করতে পেরেছে।

অনুশীলনী

১। 'বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই এক অবিস্মরণীয় দিন।"
—দিনটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেন অবিস্মরণীয় বুঝাইয়া দাও।

২। চন্দ্রপৃষ্ঠে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) মর্ত-মানুষের প্রথম পদচিহ্ন……একান্ত কামনা।

(খ) মহাশূন্যে চন্দ্র……জেগে থাকবে অনন্তকাল।

৪। টীকা লিখ :

কৃত্রিম উপগ্রহ, নভশ্চর, য়ুরি গ্যাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং, ঈগল।

৫। বাক্যরচনা কর :

অদম্য, অব্যাহত, উন্মোচিত, প্রদক্ষিণ, স্মৃতিচিহ্ন।

৬। পদান্তর কর :

আহ্বান, মাটি, পৃথিবী, দূর, অঙ্কন, আঘাত, চন্দ্র, চিহ্ন, কথা, আহার, ধর্ম, প্রমাণ।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

প্রাচীন, কৃত্রিম, আরোহণ, মর্ত্য, সমতল, নতুন, সঠিক, বৃদ্ধি।

Journey to the Moon — a new age of Science

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিকথা

স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। পশুপক্ষীও এই বোধ হইতে মুক্ত নয়। খাঁচার পাখী তাই পাখা ঝাপটায় মুক্তির প্রেরণায়।

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দ্বিশত বৎসর খাঁচার পাখীর মতই বন্ধন দশায় আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতকে নির্যাতন যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন জনসাধারণের কণ্ঠে বন্ধনমুক্তির সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, পশ্চিমে আফগানিস্থান, পূর্বে ব্রহ্মদেশ—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ছিল আমাদের এই ভারতবর্ষ। এই সময় ভারতের ধন ঐশ্বর্যের কথা প্রতীচ্যের অধিবাসীদের নিকট রূপ-কথার মত শুনাইত। এদেশ হইতে রপ্তানী করা মূল্যবান মসলিন বস্ত্র, মশলা প্রভৃতি ইয়োরোপের বিভিন্ন বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। এই ব্যবসায়ের মুনাফার অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্যের আরব ব্যবসায়ীরা লাভ করিত। স্থলপথে ভারতবর্ষে আসা ইয়োরোপীয় বণিকদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য একটি নূতন পথের সন্ধান করিতেছিল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গমা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া জলপথে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর হইতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজরা পরপর এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারতের খণ্ডরাজ্যগুলিতে পারস্পরিক কোন ঐক্য ছিল না। যুদ্ধ ও বাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে এই অনৈক্যের সুযোগ লইয়া তাহারা তখন সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় মত্ত হইয়া উঠিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ইংরাজরা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিল এবং ক্রমে ক্রমে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষই তাহাদের

অধিকারে চলিয়া গেল। ইংরাজরা তখন এদেশের ধন সম্পদ নানা কৌশলে সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেশে পাঠাইতে লাগিল।

ভারতবর্ষরে চিন্তাশীল জননায়কদের মনে ইংরাজ শাসনের সর্বনাশা রূপটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাঁহারা দেশকে ইংরাজ শোষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায়কে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন, অপরদিকে এই দেশে দ্রুত ইংরাজীশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়াসী হইলেন। রামমোহনের অল্পকাল পরেই জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীক প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার মাটিতে আবির্ভূত হইলেন। বাংলার নারীজাতি তাঁহারই দরদী চেষ্টায় সামাজিক লাঞ্ছনার হস্ত হইতে বন্ধন মুক্তির আলোক দেখিতে পাইল। বাংলাভাষাও তাঁহারই প্রচেষ্টায় একটি গঠনরূপ পাইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর মহারানী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। তিনি ভারতীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু ইংরাজের অভিসন্ধি ধীরে ধীরে ভারতীয় জননায়কদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য তখন ভারতের নেতৃবৃন্দ একটি উপায় নির্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল।

ইংরাজদের অত্যাচারের মাত্রা কিন্তু দিন দিন বাড়িয়া চলিল। শেষ পর্যন্ত দেশের যুবশক্তি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের অভিযোগে দামোদর হরি চাপেকারের প্রথম ফাঁসী হইল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুরু হইল সশস্ত্র আন্দোলন। বাংলাদেশ ইহাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিল।

অনুশীলন পার্টি গঠিত হইল। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ, পুলিনবিহারী দাস প্রমুখ নেতারা বিপ্লবের মশাল তুলিয়া লইলেন। অনুশীলন পার্টিকে অনুসরণ করিয়া যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি, মুক্তি সঙ্ঘ প্রভৃতি অনেকগুলি দল গড়িয়া উঠিল। সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় প্রধান ভূমিকা নিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), অবিনাশ ভট্টাচার্য, বারীণ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবিগণ।

ইংরাজ সরকারও বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা স্বরু করিয়া দিলেন। লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুই ভাগ করিয়া ফেলিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বুরু হইল। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বাংলার তরুণবীর ক্ষুদিরাম বসু গলায় ফাঁসীর দড়ি পরিয়া প্রথম শহীদের কৃতিত্ব অর্জন করিলেন। সহযোগী বীর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষা করিলেন। জনমতের চাপে ইংরাজ সরকার নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ; ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাসমর স্বুরু হইল। এই সুযোগে ভারতবর্ষে ইংরাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন চলিতে লাগিল। এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন দুঃসাহসী রাসবিহারী বসু, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার মহতী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল এবং পরে তিনি জাপানে পলায়ন করিয়া তথায় ভারতের পক্ষে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যখন এই পর্যায়ে চলিতেছিল তখন জাতীয় কংগ্রেসের নায়ক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক ইত্যাদি। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করিলেন।

ইঁহার পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গুজরাটের অধিবাসী—পেশায় ব্যারিষ্টার ; দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সহিত ইংরাজ শাসকদের

নিকট চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাঁহার নূতন রাজনৈতিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা লইয়া ভারতবর্ষে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তখন সময়টা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরাজ সরকার এক নৃশংস অত্যাচার চালাইলেন। কয়েক শত শান্ত আবালবৃদ্ধবনিতা ইংরাজের কামানের গোলায় মৃত্যু বরণ করিল। সারা ভারত এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইংরাজের পশুশক্তিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রুদ্র ভারতের রোষ তখন উত্তাল হইয়া উঠিল। কিন্তু কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ভারতবাসীকে নূতন মন্ত্র ও পথের সন্ধান দিলেন। নেতৃত্ব দিতে গেলে যে ত্যাগ করিতে হয় মহাত্মার জীবনে তাহা পরিপূর্ণভাবে দেখা গিয়াছিল। তাই ভারতবাসী এত সহজে তাঁহার নেতৃত্বে আন্দোলনে সাড়া দিতে পারিয়াছিল। তিনি সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, লবণ আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতীয় মানসলোকে এক নূতন চেতনা সঞ্চার করিলেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইল। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, ইংরাজ শাসন ও শোষণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভই ভারতের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। দীর্ঘ আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল অন্যদিকে বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" সমাধা হইল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ইহা এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজরা প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। সুভাষচন্দ্রও কারাগারে ছিলেন। পরে অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। এই সুভাষচন্দ্র বাংলার দুর্দ্ধর্ষ সন্তান। বিখ্যাত বসু পরিবারে ইঁহার জন্ম। প্রসিদ্ধ আইনজীবী জানকীনাথ বসুর পুত্র সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সময়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে

তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত মনোভাব দেখাইয়া কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশে ফিরিয়া মহাত্মার নির্দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সরকার ইঁহাকে বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। নিজগৃহে অন্তরীণ থাকিবার সময় তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন—ইংরাজ-গুপ্তচর বাহিনী নির্বোধ হইয়া গেল। তিনি তখন জার্মানীতে পৌছিয়া গিয়াছেন। সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি দল গঠন করেন, কিন্তু রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সাবমেরিণে করিয়া জাপানে চলিয়া আসিলেন। এখানে রাসবিহারীর সাহচর্যে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটি সৈন্যদল গঠন করিলেন। সুভাষচন্দ্র সসৈন্যে ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়া যে বীরত্ব ও ত্যাগনিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আসাম পর্যন্ত আসিয়াও তিনি খাদ্যাভাব ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য শেষ পর্যন্ত পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন।

এদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি উচ্চস্থানীয় কর্মীদের সহযোগিতায় ১৯৪২-এর ৯ই আগষ্ট "ভারত ছাড়" আন্দোলন সুরু হইল। কিছুদিনের মধ্যে বালিয়া, বস্তার, মেদিনীপুর কার্যতঃ স্বাধীনতা লাভ করিল। ভারতের সর্বত্র সহস্র সহস্র আন্দোলনকারী ও নিরপরাধ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইল। সারা ভারত কারাগারে পরিণত হইল। ইংরাজেরা বুঝিতে পারিল যে ভারতবর্ষকে আর পরাধীনতার বন্ধনে রাখা যাইবে না। এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স একটি মীমাংসার সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ভারতে আসিলেন। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মোহম্মদ আলি জিন্না ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসিলেন, ক্রীপ্‌স মিশন ব্যর্থ হইয়া গেল।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইংলণ্ডে তখন শাসন ক্ষমতায় ছিল শ্রমিক দল।

প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করিয়া পাঠাইলেন। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করিয়া লইতে চাহিলেন। দীর্ঘদিন ব্যর্থ আলোচনা চলিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করিয়া দিল। ইহার পরিণতিতে সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হইয়া গেল। কলিকাতা, নোয়াখালি, পাঞ্জাব, বিহার ও অন্যান্য স্থানে হিংস্রতা যেভাবে স্বরূপ প্রকাশ করিল তাহা ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতের অঙ্গচ্ছেদ স্বীকার করিয়া লইল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের কিয়দংশ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইল এবং বাকী অংশ ভারতেই থাকিয়া গেল। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ সরকার ভারতীয়দের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করিলেন। অসংখ্য লোকের চরম ত্যাগ, গান্ধীজীর যোগ্য নেতৃত্ব ও নেতাজীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান সব মিলিয়া আজিকার স্বাধীন ভারত। জয়তু ভারত!

অনুশীলনী

১। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান কি?

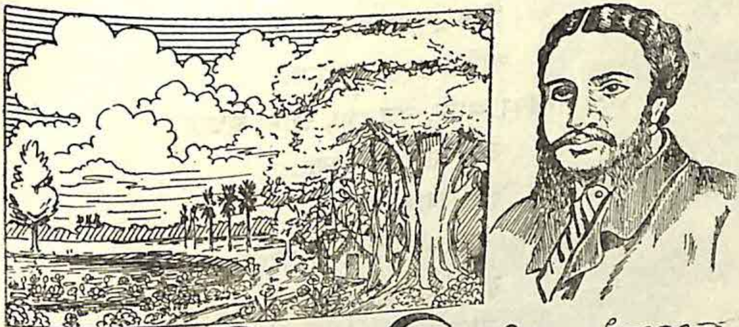
২। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে? ইহা কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? কি অবস্থায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

৩। স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিচয় দাও।

৪। ব্যাখ্যা লিখ:

নেতৃত্ব দিতে গেলে……দেখা গিয়াছিল।

Story of India's struggle for independence



বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল' দোষ, গুণ ধর',
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সু বরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

অনুশীলনী

১। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি জন্মভূমির নিকট যে-প্রার্থনা করিয়াছেন, নিজ ভাষায় তাহার বিবরণ দাও।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) জন্মিলে মরিতে হবে……জীবন নদে ?
(খ) সেই ধন্য নরকুলে……সর্বজন।
(গ) ফুটি যেন……কি শরদে !

৩। অর্থ লিখ :

খেদ, নীর, শমন, তামরস।

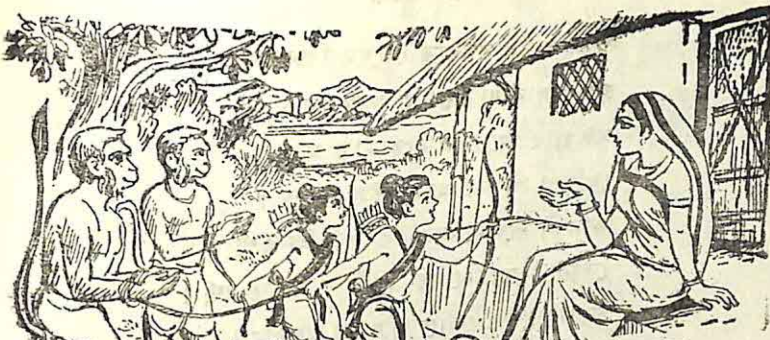
৪। পদ-পরিবর্তন কর :

দেহ, আকাশ, অমর, স্থির, কুল, জল, শরদ।

৫। গদ্যরূপ লিখ :

সাধিতে, পরমাদ, ভরি, যাচিব।

Attachment to and attraction for the motherland.



শ্রীরামের পরাজয়ে সীতার শোক

— কৃত্তিবাস ওঝা

দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে মাগো, দেখহ আসিয়া॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখ এনেছি মা, রাম-আভরণ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিলা তখন।
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন॥
হায় হায়, কি করিলি ওরে লব-কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
কোন্‌খানে মারিলি সে কমল-লোচনে।
চল শীঘ্র পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
কোন্‌খানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ।
শৃগাল-কুক্কুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ॥
ধেয়ে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বাঁধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুই ভাই কাঁদে॥

সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্ত-পদ বাঁধা হনুমান্ জাম্বুবান্ ॥
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হতাশ ॥
জানকী বলেন, লব, কি করিলি কর্ম্ম
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতি-ধর্ম্ম ॥
তোমা হ'তে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান্।
এই হনুমান্ মোরে দিলা প্রাণদান ॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনুমান্ পুত্র মোরে করেছে উদ্ধার ॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক ॥
পিতৃ-পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাৎ।
কলঙ্ক না লুকাইবে, হইবে বিখ্যাত ॥
কোথায় মারিলি তাঁরে, শীঘ্র চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥

অনুশীলনী

১। লবকুশ মাতা জানকীকে যুদ্ধে রামচন্দ্র ও তাঁহার বাহিনীকে পরাজিত করিবার সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রের আভরণ দেখাইলে সীতা কি বলিয়াছিলেন তাহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ কর।

২। রামচন্দ্র দুইপুত্র লবকুশের হস্তে পরাজিত হইলে সীতা কিভাবে তাঁহার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা লিখ।

৩। লবকুশ কোন্ দুইটি জন্তু ধরিয়া আনিয়াছিলেন? তাহারা কি সত্যই জন্তু? সীতার নিকট লবকুশ ইহাদের কি পরিচয় পাইয়াছিল?

৪। কবিতাটি হইতে প্রথম ও শেষ আট পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৫। শব্দার্থ লিখ:
দুর্জ্জয়, করাঘাত, আভরণ, পৌরুষ, মৃতপ্রায়।

Sita's lamentation ~~for~~ the death of Rama.



কৌরবসভায় কৃষ্ণ

কাশীরাম দাস

শুন ধৃতরাষ্ট্র আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন॥
ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর॥

কুল ক্ষয় জানি মনে সবে ক্ষমা দিল।
বিনয়ে আমাকে সেই এখানে পাঠাল॥
যা বলিল ধর্ম্মরাজ শুন বলি তাই।
ভাই ভাই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই॥

নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভুগি মুক্ত হইলাম তাতে॥
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া কর প্রীতি আমার সহিত॥

সভামধ্যে যত কিছু কৈলে অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান॥
সে সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম ঘটিল তেমনে॥

এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর॥
যাহা চিত্তে লয় তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর॥

শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যাহা বলি পাঠাইল পাণ্ডু পুত্রগণ॥
পাণ্ডবেরা তব কিছু না করে অকার্য্য।
উচিত ছাড়িয়া দিতে তাহাদের রাজ্য॥

যে নিয়ম করেছিল হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ॥
এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম্ম।
সংসার জুড়িয়া হবে তব অপকর্ম্ম॥

পূর্ব্ব অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্য ধনরত্ন ছিল গ্রাম পূর॥
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে।
নাহি দিলে পরিণামে পাবে দুঃখ মনে॥

অনুশীলনী

১। (ক) কৌরব সভায় কৃষ্ণ কাহার নির্দেশে আসিয়াছিলেন?
(খ) তিনি কাহাদের উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তব্য রাখিয়াছিলেন?

২। (ক) শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় যে কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিজ ভাষায় লিখ।
(খ) কৌরব সভায় কৃষ্ণ যে দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে পাণ্ডবদের কি বলা হইবে?
(গ) ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সরল ভাষায় প্রকাশ কর।

৩। (ক) ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি তাহা লিখ।
(খ) যুধিষ্ঠিরকে ধর্মাত্মা ও ধর্মেতে তৎপর বলিবার তাৎপর্য কি?

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়।

Krishna's message to the Kaurava



স্পর্শমণি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা-হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর?"
বিপ্র কহে, "কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম
জিলা বর্ধমানে;
এত বড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমি জমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা—
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে
পূরিবে প্রার্থনা—
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়;
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তারি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।"
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন,
'কী আছে আমার।

যাহা ছিল সে সকলি
ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষা মাত্র সার।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে,
সাধু ফুকারিয়া উঠে
"ঠিক বটে ঠিক!
একদিন নদীতটে
কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে
সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর,
দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি
খুঁড়িয়া বালুকা রাশি
পাইল সে মণি ;
লোহার মাদুলি দুটি
সোনা হয়ে উঠে ফুটি
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মন বালুর' পরে
বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোল গানে
চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।
নদীপারে রক্তচ্ছবি
দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে ;
তখন ব্রাহ্মণ উঠে
সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
"যে ধনে হইয়া ধনী
মণিরে মানোনা মণি
তাহার খানিক
মাগি আমি নতশিরে"
এত বলি নদী নীরে
ফেলিল মাণিক।

অনুশীলনী

১। বিপ্র সনাতনের নিকট নিজের যে পরিচয় দিয়াছিল তাহা লিখ।
২। কবিতাটির মূল ভাবটি নিজের কথায় প্রকাশ কর।

আবার তোরা মানুষ হ'

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়



কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের' পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হ'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এ হতাশাময় বর্ত্তমান;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;
ভুলিয়া যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক্‌না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে;
সবার বাড়া শত্রু সে, আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক্;
পুণ্য সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রুর হোক্;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক্,—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

প্রার্থনা

প্রিয়ংবদা দেবী

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রি, জীবধাত্রি! নিত্য দিনযামী
মাতৃ হৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি, নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন মাঝে ; শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-মন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্ত বদন ;
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজ্জ্বলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক, ভূলোক !

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে শোককাতর মাতৃহৃদয়ের যে ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নিজ ভাষায় প্রকাশ কর।

২। কবি কাহার নিকট কাহার জন্য তাঁহার মনের বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন ?

৩। কবি তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি কোথায় লয় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন ?

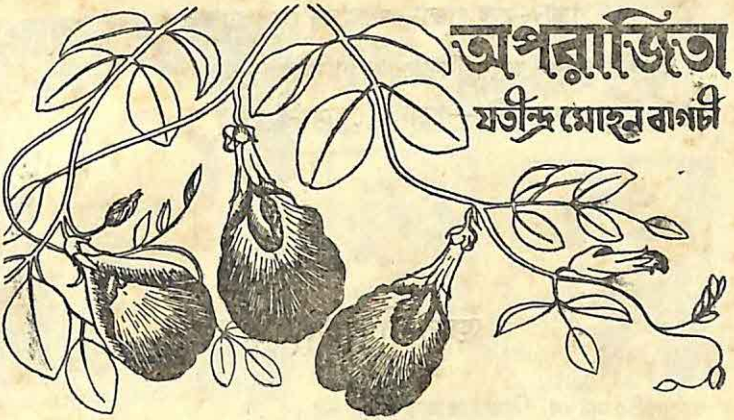
৪। ব্যাখ্যা লিখ :—করি দাও লয়……স্পন্দন মাঝে।

৫। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য গঠন কর :—জীবধাত্রি, দিনযামী, প্রবাসী, ব্যাকুল, মহিমা, বিয়োগ, বদন, উজ্জ্বলিয়া, দ্যুলোক, ভূলোক, নিমেষ।

earth her greatest tolerance ... wants to be instructed that from mother earth

অপরাজিতা

যতীন্দ্র মোহন বাগচী



পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম ?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে ?
বর্ণ—সেও ত নয় নয়নাভিরাম !

ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু সৌরভ
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি,
গরবিণি, তোর কিসে তবে গৌরব ?
রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি ?

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে, মোর কিছু নাই—কিছু নাই ;
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে',
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই !

ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাই নাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান ;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক ?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা—জীবনের মোর ব্রত :
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী,—তিনিও তোমারি মত ?

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মকথা নিজের ভাষায় রচনা কর।

২। কবিতাটিতে যে ক্ষুদ্র ফুলের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের গুণগুলি উল্লেখ কর।

৩। রূপগুণহীন ফুলটির নাম অপরাজিতা কোন্ দিক্ হইতে সার্থক তাহা দেখাও।

৪। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া প্রথম আট পঙ্‌ক্তি ও শেষ আট পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৫। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কালো আঁখিপুটে……আমি শুধু তাই !

(খ) মোর ঠাঁই শুধু ·· তোমারি মত ?

৬। পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম ?

—বাক্যটিতে বিপরীতার্থক শব্দযুগল বাহির কর এবং কোন্‌টি কোন্ লিঙ্গ তাহা লিখ।

৭। শব্দার্থ লিখ :—

নয়নাভিরাম, সৌরভ, কাঞ্চন-ভাতি, বিড়ম্বনা, আঁখিপুট, ম্রিয়মাণ, অন্তরযামী।

To worship is the only duty of Aparajita



বিদ্যাসাগর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।

নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার ।
দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য-মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার !

নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ-আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।

এত দিনেও তোমার অভাব পূরল নাকো আর,
দীর্ঘ কালেও পুরাণো শোক আজ নূতন প্রায়,
তাইত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের' পর ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা—জীবনের মোর ব্রত :
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী,—তিনিও তোমারি মত ?

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মকথা নিজের ভাষায় রচনা কর।

২। কবিতাটিতে যে ক্ষুদ্র ফুলের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের গুণগুলি উল্লেখ কর।

৩। রূপগুণহীন ফুলটির নাম অপরাজিতা কোন্ দিক্ হইতে সার্থক তাহা দেখাও।

৪। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া প্রথম আট পঙ্‌ক্তি ও শেষ আট পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৫। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কালো আঁখিপুটে……আমি শুধু তাই!

(খ) মোর ঠাঁই শুধু … তোমারি মত ?

৬। পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম ?

—বাক্যটিতে বিপরীতার্থক শব্দযুগল বাহির কর এবং কোন্‌টি কোন্ লিঙ্গ তাহা লিখ।

৭। শব্দার্থ লিখ :—

নয়নাভিরাম, সৌরভ, কাঞ্চন-ভাতি, বিড়ম্বনা, আঁখিপুট, ম্রিয়মাণ, অন্তরযামী।

To worship is the only duty of Aparajita



বিদ্যাসাগর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।

নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার ।
দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য-মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার !

নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ-আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।

এত দিনেও তোমার অভাব পূরল নাকো আর,
দীর্ঘ কালেও পুরাণো শোক আজ নূতন প্রায়,
তাইত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের' পর ।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত—একটি তেমন লোক,
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !   যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।

রিক্ত-হাতে করবে যেজন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,
রাত্রে স্বপন, চিন্তা দিনে, দেশের দশের হিত ;
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হবে,—চাই সে এমন বীর।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধুলায় ধূসর বাঁকা চটি, যা ছিল ওই পায় ;
সেই যে চটি, উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক-একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে, শিষ্ট ব্যবহার।

অনুশীলনী

১। কবি বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বিশদ আলোচনা কর।

২। বিদ্যাসাগর কবিতা হইতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের পরিচয় দাও।

৩। বিদ্যাসাগরের আদর্শ কি বাঙালী জাতি লইতে পারিয়াছে ?

৪। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটির সম্বন্ধে উল্লেখের কারণ কি ?

৫। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) সাগরে যে অগ্নি ·····হয়েছে প্রতায়।

(খ) দয়ার স্নেহে ···চিত্ত চমৎকার।

(গ) স্মরণচিহ্ন রাখতে ····নাহি চাই।

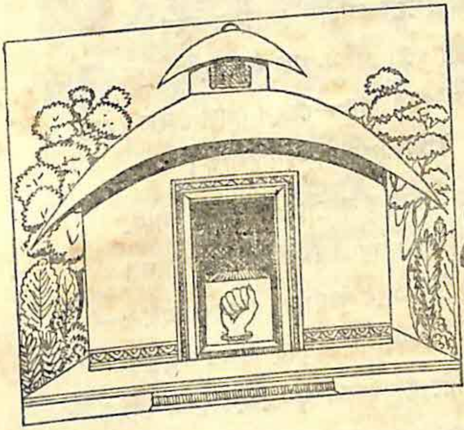
(ঘ) সেই যে চটি·····শিষ্ট ব্যবহার।

৬। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া যে অংশটি তোমার পছন্দ তাহা লিখ।

৭। নীচে উল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ এবং বাক্যে প্রয়োগ কর :—
উদ্বেলিত, প্রত্যয়, নিঃস্ব, পারাবার, সৌম্য, অকিঞ্চন, অভাজন, নিরন্তর।

৮। পদ পরিবর্তন কর :—উদ্বেলিত, অবিশ্বাসী, নিঃস্ব, বিশাল, মূর্ত, রিক্ত।

Some salient features of Vidyasagar's





মুঠি-মন্দির

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অজয়ের তীরে ছোট এক গ্রাম, বড় মন্দির তাতে,
উৎসব হয় ভাদ্রমাসের শেষ-পূর্ণিমা-রাতে।
নাহি দেবদেবী, মর্মর-বেদী—রয়েছে তাহাতে ফুটি,
লাল পদ্মের মতো মনোহর—রমণীর এক মুঠি।
দেখে ভাবি আমি হয়তো রমণী হবে কোন বীর নারী,
অজ্ঞাত গ্রাম - ঝান্সির রাণী—না থাকুক তরবারি।
মন্দিরে আছে বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্যের যে ছায়া,
অটুট আখরে কি লেখা রয়েছে পড়িতে নারিনু তাহা।
শিক্ষিত এক পল্লী যুবক গম্ভীরভাবে বলে—
"ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিই রাজে মর্মর শিলাতলে।"
স্বভাব-সিদ্ধ অজ্ঞতা লয়ে পূজারী বলিল মোরে—
"শ্মশান-কালীর মুষ্ঠি জেনেছি কালিকা-পুরাণ প'ড়ে।
বছর ধরিয়া মুঠি চাল রাখি, ভাদ্রেতে হয় মেলা,
তাই সবে বলে মুঠি-মন্দির—এসব দেবীর খেলা!
পূজোর সময় এ পাষাণ বেদী ভ'রে দিতে হয় জলে,
সলিলের 'পরে পূজো হয় তাই 'জলদেবী' কেহ বলে।
পূজারীর কথা ধরিল না মনে, শুধাই যেখানে যাই ;
শেষে বুড়ো এক মোড়লের কাছে ঠিক সন্ধান পাই।

কহিল বৃদ্ধ—শুনেছি বাল্যে প্রাচীন লোকের মুখে—
কোন্ যুগে এল প্রবল বন্যা প্রথম অজয়ের বুকে ;
ভেসে গেল গ্রাম, ধন প্রাণ মান—ভেসে গেল ছেলে মেয়ে
কতই ডুবিল, কতই উঠিল দূরে আশ্রয় পেয়ে।
একটি রমণী ভাসিতে ভাসিতে লাগে এ গ্রামের কাছে,
লৌহ-কড়ায়ে ছোট শিশু তার এখনও ঘুমিয়ে আছে।
মৃত নারীদেহ—গ্রামবাসী সবে আসিয়া দেখিল প্রাতে—
এক হাতে আছে ধরি তরুশাখা, কড়াই অপর হাতে।
জানে না কিছুই, কাঁদিতেছে ছেলে ঘুম থেকে যেন উঠি—
জননী মরেছে, তবু দৃঢ়তর রয়েছে তাহার মুঠি !
দেখিয়া দারুণ করুণ দৃশ্য দূরের দূরের লোকে
কাঁদিল সকলে অজানা অচেনা মাতার মৃত্যু-শোকে।
একমাস ধরি বহু শ্রম করি গুণী ভাস্কর জুটি—
রাঙা প্রস্তরে অমর করিয়া রচিল মায়ের মুঠি।
এটি আমাদের মাতৃতীর্থ—এইটুকু জানি নিজে।”—
বলিতে বলিতে বুড়ার চক্ষু অশ্রুতে উঠে ভিজে।
মন্দির দেখে ফিরিলাম ঘরে—কেমন করে যে মন
পারিনি এড়াতে স্নেহ-গ্রন্থির নিবিড় আকর্ষণ।

অনুশীলনী

১। 'মুঠি-মন্দির' কবিতায় বর্ণিত মন্দিরটির বিবরণ দাও। এই প্রসঙ্গে মন্দির সম্বন্ধে শিক্ষিত পল্লী যুবকটির ও পূজারীর ধারণা ব্যক্ত কর।

২। মন্দিরটির নাম 'মুঠি-মন্দির' হইল কেন আলোচনা কর।

৩। 'এটি আমাদের মাতৃতীর্থ—এইটুকু জানি নিজে।'—কাহার উক্তি ? কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এই উক্তিটি করিয়াছেন ? 'মাতৃতীর্থ' বলিবার কারণ বুঝাইয়া দাও।

৪। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) দেখে ভাবি আমি……তরবারি।

(খ) জানে না কিছুই……মুঠি !

Mother's affection towards her child reigns above all

হরিদাস



কবিশেখর কালিদাস রায়

সাধক হরিদাস বাজায়ে একতারা গাহিয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশুপাখী, তটিনী তটশাখী তাহার সঙ্গীত শোনে।
ঘুরে সে পথে পথে পল্লী জনপদে পাগল ভিখারীর সাজে,
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে আসেনা নগরের মাঝে।

একদা সম্রাট কহিল, "তানসেন, তোমার গুরু যেই জন,
তাঁহার সঙ্গীত শোনাতে হবে আজ, মাগি হে তাঁর দরশন।"
এতেক কহি' নৃপ ছদ্মবেশ ধরি, চলিল তানসেন সাথে।
শুনিল প্রাণ ভরি'—বিভোর হরিদাস গাহিছে একতারা হাতে।
কহিল, "তানসেন রাগিণী তাললয়ে অনেক গেয়েছ ত গান;
আজি যা' শুনিলাম, তাহার মত কই আকুল করে না ত প্রাণ?"
কহিল তানসেন, "কাহার সাথে মোর তুলনা কর, হায় ভূপ!
গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী কোথা, রুদ্ধবারি কোথা কূপ?
গন্ধ মধু ভরা কোথা সে সরোরুহ ঋষি যা' সঁপে দেবতায়?
কোথা এ উপবনে রঙীন গুল যাহা বিলাস লাগি' ফুটে হায়।
ভারতভূপ! তব আদেশমত গাই আমি এ লোকসভা মাঝে,
বিশ্বভূপালের সভায় গান তিনি, তুলনা কি তাঁর সাথে সাজে?"

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মার্থ নিজ ভাষায় প্রকাশ কর।
২। সাধক হরিদাস কে? তানসেনের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক? তিনি কোথায় গান করিতেন?
৩। সম্রাট তানসেনের গানের বিষয়ে কি বলিয়াছিলেন? গান শুনিয়া সম্রাটের কি ধারণা হইল?
৪। তানসেন সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে কি বলিয়াছিলেন?

Song is sweetest when it is sung spo
taneously, not at the command to please
...body.





বিয়ে বাড়ি ঃ   বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য
একটি ধারে তৈরী হচ্ছে নানারকম খাদ্য ;
হৈ-চৈ আর চেঁচামেচি, আসছে লুচির গন্ধ,
আলোয় আলোয় খুসী সবাই, কান্নাকাটি বন্ধ,
বাসর ঘরে সাজছে ক'নে সকলে উৎফুল্ল,
লোকজনকে আসতে দেখে কর্তার মুখ খুলল ঃ
"আসুন, আসুন—বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য ;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।"
বর আসেনি, তাই সকলে ব্যস্ত এবং উৎসুক,
আনন্দে আজ বুক সকলের নাচছে কেবল ধুক-ধুক,
'হুলু দিতে তৈরি সবাই, শাঁখ হাতে সব প্রস্তুত,
সময় চলে যাচ্ছে ব'লে মনটা করে খুঁত খুত।
ভাবছে সবাই কেমন ক'রে বরকে করবে জব্দ,
হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে গাড়ীর শব্দ ;
হুলুধ্বনি উঠল মেতে, শাঁখ বাজল জোরে,
বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল পথের মোড়ে,
কোথায় বরের সাজ সজ্জা ?   কোথায় ফুলের মালা ?
হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, পালা, পালা, পালা।

বর নয়কো, লাল পাগড়ী পুলিশ আসছে নেমে !
বিয়ে বাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল ঘেমে,
বললে পুলিশ ঃ এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন ?
পঞ্চাশ জন কোথায় ? এ যে দেখছি হাজার জন !
এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে,?
থানায় চলো, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে।
কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মকথাটি নিজের কথায় সাজাইয়া লিখ।

২। বিয়ে বাড়ির দৃশ্যের একটি বর্ণনা দাও।

৩। পুলিশের মুখে পঞ্চাশজন ও ক্ষুদ্র আয়োজন কথাটির তাৎপর্য কি এবং কি প্রসঙ্গে কথাটি বলা হইয়াছে ?

৪। কবিতাটি হইতে প্রথম ও শেষের ছয় পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৫। নিম্নের শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—
কাঙালী, পুলিশ, কর্তা, বর।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত রূপ লিখ :—
ক্ষুদ্র, জোরে, প্রস্তুত, বন্ধ, হৈ-চৈ, ব্যস্ত।

৭। নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তির পরিচয় দাও :—
(ক) বাসর ঘরে সাজছে কনে, সকলে উৎফুল্ল।
(খ) থানায় চলো।
(গ) চোখেতে জল আসে।

৮। বাক্য গঠন কর :—
হৈ-চৈ, চেঁচামেচি, উৎফুল্ল, যৎসামান্য, দৃষ্টি, উৎসুক, ধুকধুক, খুঁত খুঁত, সাজসজ্জা, কাঁদো কাঁদো।

Food is for proper utilisation not for misuse

ফাগুন দুপুরে

সজনী কান্ত দাস

ফাগুন-দুপুরে আগুন জ্বলিছে খাঁ খাঁ করে চারিদিক,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের' পরে—
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর মরীচিকা যেন ঠিক ;
শ্মশান নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।

অর্গল-আঁটা সব বাতায়নে, পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়িছে কিসের লোভে ;
কপোত-কপোতী আলিসার কোণে ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা কা করে কাক যেন কী মনঃক্ষোভে।

পতিত পত্র দেবদারু-শাখে ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল তরু এলায়েছে পাতাগুলি।
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে সুনিভৃত আশ্রয় ;—
তপ্ত উঠানে ফেরেনা কাকলি তুলি।

ঘূর্ণী হাওয়ায় শুষ্ক পত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধূলি কুণ্ডলী কভু না ধরিছে ফণা,
বাতাস কাঁদিছে অতিদূরে কোথা চাপা কান্নার সুরে
'ফাগুন-আগুনে, যেন সে ক্ষুণ্ণমনা।'

অনুশীলনী

১। কবিতাটির যে কোন আটটি পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

২। ফাল্গুন মাসের দুপুরবেলায় যে দৃশ্যটি কবিতাটিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

৩। দুপুর বেলায় কোন্ কোন্ পাখী কবির চোখে পড়িয়াছে ? উহারা কি বন্য ?

৪। বাতাসের কাঁদিবার তাৎপর্য কি ? ফাগুন আগুন কথাটি বলিতে কি বুঝ ?

৫। ব্যাখ্যা লিখ :—বাতাস কাঁদিতে······ক্ষুণ্ণমনা।

A natural scenery in the early spring.





হাবড়া-মাঠে কুস্তি হবে গোবরা এবং গামার,
দেখতে সেটা ইচ্ছা হ'ল নন্দলালের মামার।
স্বয়ং তিনি কুস্তি লড়েন,
মুগুর ভাঁজেন স্যাণ্ডো করেন,
বুকের উপর পাথর রাখেন বোতাম খুলে জামার।

অনেক রকম কায়দা-কানুন জানেন তিনি আবার,
পাঞ্জাবেতে পাঞ্জা ল'ড়ে মঞ্জুমিঞা সাবাড়।
এই সেদিনে পাটনা জেলায়
তাঁহার সাথে কুস্তি খেলায়
পাক্কা পুরো হারটি হ'ল ছট্টুলালের বাবার।

এমন অনেক ভীষণ কথা বলেন তিনি দেদার,—
অবাক্ হয়ে শুনতে থাকি নন্দ, আমি, কেদার—
'মাসেল্' টিপে দেখান মামা,
শক্ত যেন ইটের ঝামা,
অবাক হয়ে আমরা কেবল তাকাই ওধার-এধার।

এমন ভীষণ মামার কাছে স্পর্ধা দেখ হরির—
বললে কিনা—'তোমার তো ওই হ্যাংলা-পানা শরীর।'—
শুনেই মামা ভীষণ রেগে
কাঁপতে থাকেন দূরের থেকে,
জুতোর উপর ঠুকতে থাকেন মুণ্ডুটা তাঁর ছড়ির।

ভাগ্যে মামার হাবড়া মাঠে সময় হ'ল যাবার—
নইলে পরে একটি চড়ে হরির দফা সাবাড়।
ভাগ্যে মামা গেলেন চ'লে—
রক্ষে ছিল আজ না-হ'লে ?
হাঁফটি ছেড়ে আমরা খেলাম বিকেলবেলার খাবার।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।

২। নন্দলালের মামার পরিচয় দাও।

৩। বাক্য গঠন কর :—
স্বয়ং, কায়দা-কানুন, দেদার, স্পর্ধা, মুণ্ডু, দফা, সাবাড়।

৪। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাহির কর :—
হাঁপটি ছেড়ে আমরা খেলাম বিকেলবেলার খাবার।

A juvenile poem on false vanity.



মাটির রাজা

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হবো দিনের সহচর—
বলবো, ওরে রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর।
তোদের ছেলে উঠলো জেগে, ঐ জাগে তার বাঁশী,
জাগলো তুলাল, বনের রাখাল, ওঠ্‌রে মাঠের চাষী।

শ্যাওলা হাঁসা, তুই না বলদ তুই ধারেতে জুড়ে—
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
লিখবো সবুজ কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি—
ওপর হতে করবে আশিস্‌, দীপ্ত রাঙা রবি।

ধরায় ডেকে বলবো, ওগো শ্যামল বসুন্ধরা
শস্য দিয়ো আমাদেরে এবার আঁচল ভরা।
জংলী মেয়ে ছিলে তুমি, ছিলোনাকো ছিরি
মরুর বুকে থাক্‌তে শুয়ে ফিরতে দরী' গিরি।

আমরা তোমায় পোষ মানিয়ে দিয়েছি ঘরবাড়ী
গা-ভরা তোর গয়না মাগো, ময়নামতীর শাড়ি।
জংলা কেটে ক্ষেত করেছি, ফসল যেথা ফলে,
পাহাড়ে তোর বাংলো তুলে দ্বীপ রচেছি জলে।

বন্য মেয়ে, আমরা তোরে করেছি রাজরাণী
ধুলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসনখানি।
খামার ভরে রাখবো ফসল, গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে দেবো আমি প্রাণ।

এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখবো চির-তাজা,
আমি হবো ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ।

২। 'মাটির রাজা' কথাটির তাৎপর্য কি? কবির বক্তব্য নিজ ভাষায় প্রকাশ কর।

৩। পৃথিবী বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, পূর্বেও কি এই রকমই ছিল? কাহারা বর্তমান রূপ দিয়াছে?

৪। শব্দার্থ লিখ :—

সহচর, আশিস, দীপ্ত, বসুন্ধরা, ছিরি, দরী'।

৫। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) শ্যাওলা হাঁসা ……মাঠের কবি।

(খ) জংলী মেয়ে……গিরি।

(গ) এই পুরাতন পৃথিবীকে……মাটির রাজা।

Peasants are actually the kings of the earth. They have made her beautiful and rich.